বর্দ্ধমানাধিপতি—

মাননীয় শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বিজয়চাঁদ মহ্‌তাব্‌ বাহাদুরের

করকমলে

দক্ষিণাপথ

পথের কথা

প্রতি বছরই পূজার ছুটীর পূর্ব্বে বন্ধুমহলে প্রশ্ন ওঠে, এবার কে কোথায় বেড়াতে যাচ্ছেন। এ প্রশ্ন আমাকেও অনেক শুনতে হয়। এবারও (১৩৩২ সালে) পূজার মাসখানেক আগে থেকেই অনেকে জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করেছিলেন "দাদা, এবার কোথায় যাচ্ছেন?" আমি সকলকেই সাফ জবাব দিয়েছিলাম, "কলিকাতা পরিত্যজ্য পাদমেকম্ ন গচ্ছামি"। তাঁরাও সেই কথাই সত্য ব'লে মনে করে নিয়েছিলেন।

আমার কিন্তু, কলিকাতায় থাক্‌বার মোটেই ইচ্ছা ছিল না। আমি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম যে, এবার আমার সেই ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িত, মশক-গুঞ্জিত, জঙ্গল-সমাকীর্ণ জন্মভূমিতে পূজার ছুটীটা কাটিয়ে আস্‌ব। কথাটা প্রকাশ করি নি কেন জানেন? আমার মনের মধ্যে একটা গর্ব্বের ভাব এসেছিল। যাঁরা সভা-সমিতিতে বক্তৃতা ক'রে গলা ভাঙ্গেন, যাঁরা পল্লীর জন্য চোখের জল ফেলে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠা ভিজিয়ে ফেলেন, যাঁরা না কি গ্রাম ও পল্লীর দুর্দ্দশার কথা ভেবে রাত্রে নিদ্রা যান না, অথচ যাঁরা স্বপ্নেও দেশে যাবার কথা ভাবেন না;

অবকাশ পেলে দার্জিলিং, শিমলা, কাশী, ওয়ালটেয়ার, মধুপুর ইত্যাদি ইত্যাদি স্থানে চ'লে যান, তাঁদের সুমুখে গর্ব্ব করে বলতে হবে যে, এই দেখ, তোমরা দেশে গেলে না, আর আমি ম্যালেরিয়াকে উপেক্ষা করে দেশে গিয়েছিলাম। দেখ ত, আমার জন্মভূমির উপর কেমন টান! কিন্তু, তখন কি জানি যে, আমার এই দর্প, এই গর্ব্ব চূর্ণ করবার জন্য দর্পহারী ভগবান অলক্ষ্যে ব'সে হেসেছিলেন। নইলে, কোথায় যাব আমার পল্লীভবনে—সেই পূর্ব্ববঙ্গের কাছাকাছি—তা না হয়ে বিধাতা আমাকে নিয়ে গেলেন একেবারে ভারতবর্ষের দক্ষিণ প্রান্তে—সেতুবন্ধ-রামেশ্বরে!

যখন যুবক ছিলাম, যখন শরীরে বল ছিল, যখন মৃত্যুকে পর্য্যন্ত ভয় করতাম না—বিপদ আপদ ত দূরের কথা,—তখন হিমালয়ে গিয়েছিলাম, যাওয়াটা সম্ভবও হয়েছিল, কিন্তু, এই বুড়া বয়সে, যখন এই কলিকাতা সহরের হেদোর মোড় থেকে গোলদীঘিতে যেতে হ'লে ট্রামের দিকে চেয়ে থাকতে হয়, যখন হৃদস্পন্দনের হঠাৎ আক্রমণের ভয়ে পকেটে ঔষধের শিশি নিয়ে বেড়াতে হয়, তখন যে ভারতের সুদূর দক্ষিণ সীমান্তে যাবার সাহস কেমন করে হোলো, তার একটু ইতিহাস আছে। সেই কথাই আগে বলি।

আমাদের সদাশয় ভারত গবর্ণমেণ্ট কিছুদিন পূর্ব্বে একটা কমিটি গঠন করেছিলেন। তার নাম The Indian Taxation Enquiry Committee, বাঙ্গালা তর্জ্জমা করলে দাঁড়ায় 'ভারতের কর অনুসন্ধান কমিটি' অর্থাৎ কি না, বৃটীশ ভারতবর্ষে এখন যে সকল কর প্রচলিত আছে, তাদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান। উদ্দেশ্য অতি মহান্! এই করভার প্রপীড়িত ভারতবাসীদিগের উপর আরও কোন নূতন কর বসানো যেতে পারে কি না, অথবা যে সকল কর অধুনা প্রচলিত আছে, তার কোন-

কোনটা বাড়িয়ে সরকারের তহবিলকে সচ্ছল করা যেতে পারে কি না, তারই সম্বন্ধে মতলব স্থির করবার জন্য এই কমিটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নামটা কিন্তু এমন সুন্দর যে, মনে হয় আমাদের করভারের আধিক্য দেখে পরম মহানুভব সরকার বাহাদুর এই ভারটা একটু কমাবার সাধু উদ্দেশ্য-প্রণোদিত হয়ে এই কমিটি বসিয়েছিলেন। তা নয় বন্ধু, সে আশা নেই। কমিটি যাই বলুন না কেন, কর যে বাড়বে ছাড়া কমবে না, এ কথা বালকেও বল্‌তে পারে।

যাক গে, সে ভাবনা এখন ভেবে কি হবে, এখন ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলি। এই যে কমিটির কথা বললাম, তাতে বিলাতী ও দিশী কয়েকজন সদস্য মনোনীত হয়েছিলেন, —মনে রাখবেন মনোনীত (nominated) হয়েছিলেন,—নির্ব্বাচিত (elected) হন নি। আমাদের বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এই কমিটির একজন সদস্য। ব'লে রাখা ভাল, বাঙ্গালা দেশের আর কেহ এ কমিটিতে ছিলেন না। এই সদস্য মহোদয়েরা বৎসরাধিক কাল ভারতবর্ষ এবং বঙ্গদেশের নানা সহরে নগরে বৈঠক ক'রে, ভারতের কর-বিষয়ে অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ অনেক মহাশয়ের লিখিত ও বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করেছিলেন। পরম্পরায় শুনেছি যে, সেগুলি যদি ছাপানো যায়, তা হ'লে পাচ সাতখানি অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত হতে পারে, এবং কেউ যদি ধৈর্য্য ধরে সেগুলি পড়তে পারেন, তা হোলে তার মধ্যে ষড়রসেরই আস্বাদ লাভ করতে পারেন। সাক্ষ্য গ্রহণ যখন শেষ হোলো, তখন এই গন্ধমাদন পরীক্ষা করবার জন্য ত একটা নিরিবিলি স্থান চাই। শুধু নিরিবিলি হ'লেই হবে না, স্বাস্থ্যকর হওয়া চাই, নয়ন মনোরঞ্জক স্থান হওয়া চাই। ভারতবর্ষের মধ্যে মহিসুর রাজ্যে বাঙ্গালোরই সর্ব্বাপেক্ষা মনোরম স্থান বলে গবর্ণমেণ্ট স্থির করেন। কমিটী এই পূজার পূর্ব্ব থেকে সেখানে সুখাসীন হয়ে সেই পর্ব্বতপ্রমাণ কাগজপত্র

পরীক্ষা করে রিপোর্ট লিখছিলেন। সুতরাং বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে তাঁর ঘরবাড়ী, নিজের কাজকর্ম্ম ছেড়ে সেই সুদূর বাঙ্গালোরে থাক্‌তে হয়েছিল।

কিন্তু, তা ব'লে ত আর একটানা ভাবে বিদেশে থাকা তাঁর পোষায় না; তাই তিনি মধ্যে মধ্যে কয়েকদিনের জন্য দেশে আসতেন, আবার চ'লে যেতেন। বিগত ১৩৩২ সালের শ্রাবণ মাসের শেষে বাঙ্গালা দেশে এসে কয়েক দিন পরে ভাদ্রের মাঝামাঝি সময়ে যেদিন তিনি বাঙ্গালোর যাত্রা করেন, আমি সেদিন হাবড়া ষ্টেসনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম। আমার তখন শরীর ভাল ছিল না, বড়ই দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আমার শরীরের অবস্থা দেখে বিশেষ দুঃখিত হয়ে বল্‌লেন যে, পূর্ব্বে, বছরে দুইবার ক'রে তাঁর সঙ্গে দারজিলিংয়ে গিয়ে আমার শরীর অনেকটা সুস্থ হোতো। এখন তিনি ত একরকম ভবঘুরে হয়েছেন, তাই আমারও কোথাও যাওয়া হয় না। তারপর তিনি বল্‌লেন "আমি বাঙ্গালোর চল্‌লাম। দেখি, আমার যে বাড়ী পাওয়ার কথা আছে, তাতে আপনার মত অসুস্থ ব্যক্তির থাকবার সুব্যবস্থা যদি করতে পারি, তা হোলে চিঠি লিখ্‌ব, আপনি মহারাজাধিরাজকুমারের সঙ্গে চলে যাবেন।" শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজকুমার উদয়চাঁদ মহ্‌তাব বাহাদুরও ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন; তিনিও সাগ্রহে এই প্রস্তাব সমর্থন করলেন। তিনি তখন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি-এ পড়তেন; কলেজ বন্ধ হলেই তিনি বাঙ্গালোরে বেড়াতে যাবেন, এই স্থির হয়েছিল।

মহারাজের এই প্রস্তাবে আমি হাঁ কি না, কিছুই বল্‌লাম না। তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস বললেন "বাঙ্গালোরে যে বাড়ী পাওয়া গেছে, তা তেমন বড় নয়, তবে কম্পাউণ্ড খুব বড়। আমাদেরই হয় ত তাম্বুতে বাস করতে হবে। দাদার এই দুর্ব্বল শরীরে কি

তা সইবে?" এর থেকে বুঝতে পারা গেল যে, বাঙ্গালোরে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই,—আমার পূর্ব্ব ব্যবস্থাই বহাল থাক্‌বে।

শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর বাঙ্গালোরে পৌঁছে তিন চারদিন পরেই আমাকে পত্র লিখলেন। শ্রীমান ললিত যা বলেছিলেন, পত্রেও তাই ছিল। অধিকন্তু ছিল এই যে, তখন বাঙ্গালোরে খুব বৃষ্টি হচ্চে; সেই বৃষ্টির মধ্যে তাম্বুতে থাক্‌লে, আমার শরীর ভাল থাক্‌বে কি না, এইটাই মহারাজের চিন্তার বিষয় হয়েছে। আমি তাঁর সেই স্নেহপূর্ণ পত্র যেদিন পেলাম, তার পরের দিন প্রাতঃকালেই উত্তর দিলাম যে, এত যখন অসুবিধা মহারাজ মনে করছেন, তখন আমার যাওয়া হবে না, আমি এবার পূজার অবকাশ-সময়টা দেশেই কাটাব।

সেই দিনই বিকেল বেলা সব ব্যবস্থা উল্‌টে গেল। এইখানে একটা কথা বলে রাখি। আমরা পণ্ডিত মানুষ কি না, তাই শাস্ত্র-বচন মানি। এই শাস্ত্র-বচন শিরোধার্য্য করে আমরা শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজকুমার বাহাদুরের উপাধির অর্দ্ধেক অংশ ত্যাগ করে শেষার্দ্ধ রেখেছিলাম—ধিরাজকুমার, এবং এই শেষার্দ্ধই বর্দ্ধমান-রাজ কর্ত্তৃক মঞ্জুর হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং অতঃপর অত বড় উপাধিটা বারবার না ব'লে ধিরাজকুমার বাহাদুর উপাধিটাই এই দক্ষিণাপথ-ভ্রমণে ব্যবহার করব।

বলেছি ত, সকালে যাওয়া বন্ধ করে শ্রীযুক্তমহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে পত্র লিখেছিলাম, বিকেলেই তা উল্‌টে গেল। বিকেল বেলা শ্রীযুক্ত ধিরাজ-কুমারের প্রাইভেট সেক্রেটারী আমার বাসায় এসে হাজির। তিনি বল্‌লেন যে, মহারাজের আদেশ-অনুসারে শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার সেই দিনই গাড়ী রিজার্ভ করেছেন; ১৯শে সেপ্টেম্বর, ৩রা আশ্বিন শনিবার মাদ্রাজ মেলে আমাদের যাত্রা করতে হবে। পূজার সময় অনেক আগে ব্যবস্থা না করলে রিজার্ভ পাওয়া যায় না। প্রাইভেট সেক্রেটারী মহাশয় সেই সংবাদ

আমাকে দিতে এসেছেন এবং একবার মহারাজকুমার বাহাদুরের সহিত দেখা করতে বললেন। তাঁরই কাছে শুন্‌লাম যে, যাত্রী আমরা চারি জন,—স্বয়ং মহারাজকুমার বাহাদুর, তাঁর সঙ্গে যাবেন তাঁর আত্মীয় শ্রীমান্ ভগবতীপ্রসাদ মেহেরা, আর যাবেন প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা, আর যাব আমি। স্থির হয়েছে যে, আমরা ৩রা আশ্বিন শনিবারের মাদ্রাজ মেলে যাত্রা করব, রাস্তায় কোথাও বিশ্রাম না করে একেবারে ৪০ ঘণ্টা গাড়ীতে থেকে ৫ই আশ্বিন সোমবার প্রাতঃকালে মাদ্রাজে পৌঁছিব। শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বাহাদুর ও শ্রীমান ভগবতী সেইদিনই মধ্যাহ্নের গাড়ীতে বাঙ্গালোর চ'লে যাবেন, আমি আর রামেশ্বরপ্রসাদ সারাদিন মাদ্রাজে থেকে রাত্রি দশটার ট্রেণে বাঙ্গালোর যাত্রা করব এবং পরদিন মঙ্গলবার প্রাতঃকালে বাঙ্গালোরে পৌঁছিব। মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোরে যাবার গাড়ী রিজার্ভ করবার পত্রও সেইদিনই চলে গিয়েছে।

তখন আর কি করি, শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরকে আর একখানি পত্র লিখে আমার পূর্ব্ব পত্র প্রত্যাহার করতে হোলো এবং তার পরদিনই আলিপুরে শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি পূর্ব্বেও দুইবার বাঙ্গালোরে গিয়েছিলেন, সুতরাং সেখানকার সমস্ত ব্যাপারই অবগত ছিলেন। তিনি বল্‌লেন যে, যা যা দরকার, সবই তিনি গুছিয়ে নিয়ে যাবেন, আমি শুধু পথের মত যা হয় তাই যেন নিয়ে যাই, বেশী কিছু নেবার দরকার নেই। তিনি জানেন যে, দরকার থাকলেও আমি কতকগুলো লগেজ নিয়ে পথ চল্‌বার বিরোধী। তাঁর কাছেই শুন্‌লাম, আমার কি কি দরকার হ'তে পারে, তা তিনি রামেশ্বরকে ব'লে দিয়েছেন এবং রামেশ্বরই সে সব গুছিয়ে নিয়ে যাবে, আমাকে শুধু তার সঙ্গে ষ্টেসনে যেতে হবে, এই মাত্র। শ্রীমান রামেশ্বর ও ভগবতী যখন সঙ্গে আছে, তখন যে আমার কোন অসুবিধাই হবে

এবং শ্রীমান ধিরাজকুমার যখন সহযাত্রী, তখন আমি এই দীর্ঘ পথ যে অনায়াসে যেতে পারব, এ সাহস আমার হোলো।

শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমারের নিকট বিদায় নিয়ে আমি তীর্থ রামেশ্বর দর্শনের অগ্রদূত জলজীয়ন্ত রামেশ্বরের কাছে গেলাম। সে আমাকে খুব সাহস দিল এবং যা যা বন্দোবস্ত করতে হবে, সবই সে করবে, আমাকে কিছু ভাবতে হবে না, এই আশ্বাস দিল। স্থির হোলো যে, ৩রা আশ্বিন শনিবার অপরাহ্ণ সাড়ে তিনটার সময় সে প্রস্তুত হোয়ে আমার বাসায় যাবে এবং আমাকে তুলে নিয়ে চারটার সময় ষ্টেসনে পৌছিবে—গাড়ী ছাড়বে কিন্তু পাঁচটা নয় মিনিটে। এই সব স্থির করে, বাসায় ফিরে এসে, সকলের কাছে প্রকাশ করলাম যে, আমি সেতুবন্ধ রামেশ্বরে যাচ্ছি।

তখন বাড়ীতে কলরব উঠল। ওগো, সে—কি—এখানে। এই দুর্ব্বল শরীর নিয়ে বারো-তেরশ মাইল পথ রেলে যেতে পথের মধ্যেই সব দেখা শেষ হয়ে যাবে। বন্ধুরাও অনেকে এই কথা বলেই ভয় দেখাতে লাগলেন। আমি কিন্তু স্থির চিত্ত। জীবনে অন্য কোন ব্যাপারেই কাহারও কথা অমান্য করি নে, কিন্তু, কোনখানে বেড়াতে যেতে হবে শুনলে আমি একেবারে নেচে উঠি। সেই হিমালয় যাত্রা থেকে আরম্ভ করে এই বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত বেড়াবার উৎসাহ আমার কমল না। কোথাও যাওয়ার প্রস্তাব হ'লে আমি আমার বৃদ্ধত্ব, আমার দুর্ব্বলতা, আমার ভয়ানক হৃদস্পন্দন—সব কথা ভুলে যাই, আমার হৃদয়ে যেন যৌবনের বল ফিরে আসে। আর পরীক্ষা করেও দেখেছি, এতে আমার কোন কষ্টই বোধ হয় না, কোন অসুবিধাই আমি অনুভব করি না।

অনেকের দেখি, এক দিনের জন্য কোথাও যেতে হ'লে কত উনকোটী চৌষটি গোছাতে হয়। আমার সে সব বালাই নেই। আমি আমার জীবনে অভাবকে যথাসম্ভব সংক্ষেপ করতেই অভ্যস্ত হয়েছি। দারিদ্র্যের

পীড়নে এই সুদীর্ঘ জীবনকালে কোন বিলাসিতাই আমাকে আক্রমণ করতে পারে নাই; আমি কোন কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি ক'রে কখনই নিজেকে অসুবিধায় ফেলি নি; সুতরাং পথে-ঘাটে আমার কোন কষ্টই হয় না। তাই ত, থাক্‌ব কোথায়, খাব কি, শোবার কি হবে, এ সব কথা কোন দিনই আমি আমল দিই নি। তবে, এখন বয়স বেড়েছে কি না, তাই পদব্রজে বেশী দূর চল্‌বার কথা হোলেই একটু ভয় পাই। এবার কিন্তু সে সব ভাবনাই আমার নেই; যাব রেলে রিজার্ভ গাড়ীতে, সঙ্গে থাক্‌বেন শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বাহাদুর, ভগবতী ও রামেশ্বর। গিয়ে উঠব বাঙ্গালোরে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের স্নেহ শীতল আশ্রয়ে। ইহার মধ্যে ভয় বা উদ্বেগের প্রবেশাধিকারই নেই। এক কথা এই যে, একটানে চল্লিশ ঘণ্টা রেলে যেতে হবে, কিন্তু মনস্তত্ত্ববিদ্‌, চিকিৎসকপ্রবর, সোদরপ্রতিম শ্রীমান গিরীন্দ্রশেখর বসু ভায়া বল্‌লেন "দাদা, কোন চিন্তা নেই, আপনার উৎসাহ ও উন্মাদনাই আপনাতে যথেষ্ট শক্তি সঞ্চার করবে, এ আমি ব'লে দিচ্ছি।" এইখানেই বলে রাখি যে, তাঁর মনোবিজ্ঞান-মূলক ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যসত্যই সফল হয়েছিল, এই দীর্ঘ পথ ভ্রমণে আমি কোন সময় একটুও ক্লান্তি বোধ করি নি।

সব বাধা বিঘ্ন ঠেলে ১৯শে সেপ্টেম্বর ৩রা আশ্বিন শনিবার এসে উপস্থিত হোলো। তার পূর্ব্বে, ১৭ই সেপ্টেম্বর বাঙ্গালোর থেকে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের এক জরুরী তার পেলাম। তাতে তিনি জানিয়েছেন যে, তিনি সব ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলেছেন; আমার কোন অসুবিধা হবে না। আমি যেন যেতে অমত না করি। এদিকে আমি কিন্তু যাওয়ার আয়োজন করে ফেলেছি। আর সে আয়োজনও তেমন কিছু না—শুধু একটা ছোট বিছানা, একটা ক্ষুদ্র বাক্সে কয়েকখানি কাপড়, আর একটী ততোধিক ক্ষুদ্র ব্যাগে একখানি কাপড়, একখানি গামছা,—

আর গোপন করে কাজ নেই, আমার বদ্‌-অভ্যাসের সঙ্গী অল্প কয়েকটী অর্থাৎ শ-খানেক কড়া বর্ম্মা চুরুট। যাবার দিন বৌমা বললেন, পথের জন্ত কিছু খাবার তৈরী করে দিই। কিন্তু এতকালের মধ্যে পথের ভাবনা তো কখনও ভাবি নাই। হেসে বল্‌লাম, মা, সে ভার অন্নপূর্ণার হাতে দিয়েই নিশ্চিন্ত হও; পথে খাবার ভাবনা তিনিই ভাববেন এবং তাঁর প্রতিনিধি-রাই তার ব্যবস্থা করবেন।

১৯শে সেপ্টেম্বর শনিবারও যথাসময়ে 'ভারতবর্ষ' আফিসে গেলাম। তার পূর্ব্বেই আমি কার্ত্তিকের 'ভারতবর্ষে'র সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে রেখেছিলাম; এবং কি জানি, যদি আমার ফিরতে বিলম্বই হয়, বা আর না-ই ফিরি, তা হোলেও যাতে অগ্রহায়ণের কাগজের অসুবিধা না হয়, এবং যদি না-ই ফিরি, তা হোলেও ত্রয়োদশ বর্ষের 'ভারতবর্ষে'র প্রথমার্দ্ধের শেষ সংখ্যায় (অগ্রহায়ণ মাসেই প্রথমার্দ্ধ শেষ হয়) সম্পাদক ব'লে আমার নামটা ৺ সংযুক্ত হয়ে বাহির হয়, তার ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। আফিসে গিয়ে যা'কে যা বল্‌তে হয় শেষ করে, শ্রীমান হরিদাস ও সুধাকে অভিবাদন করে, প্রেসের ম্যানেজার শ্রীমান রামকৃষ্ণকে সময়োপযোগী উপদেশ দিয়ে একটার সময় বাসায় গেলাম,—সাড়ে তিনটায় রামেশ্বর আস্‌বেন—তখনও অনেক বিলম্ব। তখন শ্রীমান গিরীন্দ্রশেখরের বাড়ী গিয়ে তাঁর উপর বাসার সমস্ত ভার দিয়ে এবং চিত্রশিল্পী শ্রীমান যতীন্দ্রকুমারের জেদে পড়ে এক মাসের মত এক পেয়ালা চা পান করে বাসায় এলাম।

একটু পরেই রামেশ্বর ট্যাক্সি নিয়ে হাজির। তখন কিন্তু আড়াইটা বেজেছে—গাড়ী ছাড়বে সেই পাঁচটা নয় মিনিটে। কি করা যায়, ট্যাক্সি বসিয়ে রেখে ভাড়া দিয়ে লাভ কি। তখনই যাত্রা করা গেল। তার পর পাকা আড়াই ঘণ্টা ষ্টেসনের প্ল্যাটফরমে অবস্থান।

সাড়ে চারটার সময় প্ল্যাটফরমে গাড়ী দিল। শ্রীমান্ ধিরাজকুমার ও

শ্রীমান ভগবতীও তথনই লোকজন সঙ্গে এসে পড়লেন। একখানি প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী মিলিত গাড়ী আমাদের রিজার্ভ ছিল; প্রথম শ্রেণীর সমস্ত কামরাটাই রিজার্ভ, দ্বিতীয় শ্রেণীর দুইটী নিম্নের আসন রিজার্ভ। আমি দ্বিতীয় শ্রেণীর একটী আসন দখল করে বসলাম। দেখি, দ্বিতীয় শ্রেণীতে আমাদের দুইটী রিজার্ভ ব্যতীত আরও একজনের একটী রিজার্ভ আসন আছে। তাঁর নাম দেখলাম মি এন বানার্জ্জি। এই বিলাতী নাম দেখেই ত ভয় হোলো। শ্রীযুক্ত দ্বিরাজকুমারের রিজার্ভ প্রথম শ্রেণীতে গেলাম না এই জন্য যে, সেখানে গায়ের জামা খুলে হাঁটুর কাপড় তুলে আয়েস করে বসতে বাধ বাধ ঠেকবে, জামাজোড়া পরে এতটা পথ ভদ্রলোকের মত যাওয়া আমার পোষাবে না, তাই রামেশ্বরকে নিয়ে এই গাড়ীতে উঠেছি, —যখন তখন গিয়ে ফাষ্ট ক্লাসে আরাম করা যাবে। এখন দেখছি, এখানেও সাহেব,—আবার যেমন-তেমন নয়, একেবারে বাঙ্গালী সাহেব—মিঃ এন, বানার্জ্জি। বিলাতী সাহেবদের সঙ্গেও কোন রকমে বাস করা যায়—একটু তোয়াজ ক'রে, কিন্তু বাঙ্গালী সাহেব—একেবারে নরসিংহ। তাঁদের আদব কায়দা, চলন-ফেরন, ভাবভঙ্গী একেবারে ফুটন্ত (boiling point) উঠেই আছে। ভীতচিত্তে, শঙ্কিত হৃদয়ে এই ইঙ্গ বঙ্গ মহাপুরুষের আগমন-প্রতীক্ষা করতে লাগলাম।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না, সাহেব দেখা দিলেন। সত্যিই সাহেব; সেই হাটকোট, সেই টাই-কলার, সেই প্রকাণ্ডকায় ট্রাঙ্ক, সেই বৃহৎ-বপু হোল্ড-অল। তিনি যখন তাঁর সাহেবী আসবাব নিয়ে গাড়ীতে উঠলেন, তখন আর তাঁর দিকে চাইতে সাহস হোলো না। কিন্তু, তিনি আমাকে দেখেই ইংরাজী না বলে, নমস্কার করে অতি বিনীত ভাবে বাঙ্গালা ভাষায় বললেন "আমাকে চিনতে পারছেন না?" তখন তাঁর দিকে চেয়ে, তাঁর সেই বিলাতী পোষাকের মধ্য থেকে চিনে ফেললাম তিনি যে

আমাদের জামাই বাবাজী শ্রীমান নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—শ্রীমান হরিদাস ভায়ার জামাতা। তখন গলায় জল এল, মুখে হাসি বেরুল। বাবাজিকে আদর করে বসালাম। তিনি হাইকোর্টের উকিল, বেড়াতে যাচ্ছেন আপাততঃ ওয়ালটেযার, পরে আরও দক্ষিণে যাবার অভিপ্রায় আছে। সঙ্গী কেউ নেই, একটী ভৃত্যও নয়। যাক, পরদিন বেলা একটা পর্য্যন্তর সুন্দর সাথী মিলল। একেই বলে সৌভাগ্য। তার পর কিন্তু আমাদের গাড়ীতে একটী খাটি সাহেবও উঠেছিলেন এবং তিনি মাদ্রাজ পর্য্যন্তই আমাদের সহযাত্রী ছিলেন। তাতে আমাদের বিশ্রামের বা আমোদ-আনন্দের ব্যাঘাত হয় নাই, কারণ সাহেবটী নিতান্তই ভালমানুষ,—সাহেবের তীব গন্ধ তাঁর গায়ে মোটেই ছিল না।

ঠিক পাঁচটা নয় মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী ছেড়ে দিল। দুর্গানাম স্মরণ করে আমরা সেতুবন্ধ রামেশ্বর উদ্দেশে যাত্রা করলাম।

রেল গাড়ীতে চড়ে একটা বিরক্তিবোধ সব সময়ই হয়। ধীরগতি যাত্রীর গাড়ীতে চড়ে যখন সব ষ্টেসনে গাড়ী থামতে-থামতে যায়, তখন মনে হয়, একটানে যদি গাড়ী চলে যায়, তা হ'লেই বেশ হয়। আবার যদি দ্রুতগামী মেল গাড়ীতে উঠে একটানে ষাট সত্তর মাইল গিয়ে গাড়ী থামে, তখন যেন হাঁফিয়ে উঠতে হয়, মনে হয় মধ্যে মধ্যে একটু জিরুলে বেশ হয়। সে দিন মাদ্রাজ মেলে উঠেও এই বিরক্তি বোধ হয়েছিল। সেই যে হাবড়া ষ্টেসন থেকে গাড়ী ছাড়ল, আর থামে না—চলেছে ত চলেছে ই। দু ঘণ্টা ক্রমাগত দৌড়ে একেবারে খড়্গপুর গিয়ে মাদ্রাজ মেল হাত-পা ছড়িয়ে বস্‌ল। এখানে গাড়ী কুড়ি মিনিটের উপর থাকে। এখান থেকে ছেড়ে এ গাড়ী যে পথে যাবে, আমি কোন দিন সে পথে যাই নি। এ রেলে আমি একদিকে পুরুলিয়া গিয়েছি, আর একদিকে চক্রধরপুর পর্য্যন্ত গিয়েছি, পুরী কটক কোন স্থানেই আমার যাওয়া হয় নাই। কিন্তু এই

অদৃষ্ট পথ দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হোলো না, খড়্গাপুরেই সন্ধ্যা হয়ে গেল। এই ষ্টেসনেই খিরাজকুমার এসে বল্‌লেন যে রেলের খাবার-গাড়ীতে আমার জন্য ভাত ও নিরামিষ তরকারী তৈরী হয়েছে; তিনি হাবড়াতেই এই আদেশ দিয়েছিলেন। আমি বল্‌লে তখনই দিয়ে যেতে পারে। তখন সবে সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা। কি করি, সেখানে খাবার না নিলে, হয় কণ্টাই রোডে আর না হয় রূপসা কি বালেশ্বরে আমার খাবার আস্‌তে পারে। তাঁরা কিন্তু তখনই খাবার গাড়ীতে ডিনার খেতে যাবেন। তাই সেই সন্ধ্যার সময়ই ভাত তরকারী আনিয়ে নিলাম, কিন্তু, তা আর বেশী খেতে হোলো না। এক দিকে শ্রীমান রামেশ্বর তাঁর খাবারের ভাণ্ডার খুলে দিলেন, আর এক দিকে জামাতা নন্দলাল বাবাজি তাঁর গৃহ হইতে আনীত সুখাদ্য পরিবেশন করলেন, সুতরাং আমার সঙ্গীদের চাইতে আমারই জিত হোলো,—তাঁরা বিলাতী খাদ্য খেলেন, আর আমি রাজভোগ খেলাম। তার পর, বিছানা ত পাতাই ছিল,—শয়ন করা গেল।

কোন দিক দিয়ে যে বালেশ্বর, ভদ্রক, বৈতরণী রোড, কটক ভুবনেশ্বর, খুরদা রোড (এখান থেকেই পুরী যেতে হয়) প্রভৃতি পার হয়ে গেল, জান্‌তেও পারলাম না। বড়ই দুঃখ মনে রইল যে সজ্ঞানে সুস্থশরীরে বহাল তবিয়তে বৈতরণী পার হতে পারলাম না।

ঘুম যখন ভাঙ্গলো, তখন দেখি, গাড়ী গঞ্জামের অন্তর্গত বহরমপুরে দাঁড়িয়ে। একেবারে উড়িষ্যার প্রান্তে এসে গিয়েছি। চারিদিকে চেয়ে দেখি, আমার সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-শীতলা শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই এতটা পথ দৌড়ে এসেছে। পশ্চিম দেশে যেতে কিন্তু এমন হয় না, বৰ্দ্ধমান ছেড়ে একটু এগুলেই মনে হয়, যেন এক রাজার মুল্লক ছেড়ে আর এক রাজার মুল্লকে এসেছি; সে

দেশের সঙ্গে আমার বাঙ্গালার কিছুই মেলে না। কিন্তু, এই যে সারা রাত্রি মেল ট্রেণে ছুটে তিন শত পঁচাত্তর মাইল এসেছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার শ্যামা প্রকৃতি-জননী এসেছেন। এখানে তাঁর শোভা যেন আরও বেড়েছে। বাঙ্গালা দেশে প্রকৃতির যে শোভা দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়, এ দিকের শোভা যেন তার থেকেও সুন্দর, তার থেকেও মনোরম। সেই দূরবিস্তৃত ধানের ক্ষেত, সেই আম-কাঁঠালের বাগান, সেই উন্মুক্ত শ্যামলতা, সেই মধ্যে মধ্যে উন্নতশীর্ষ শৈলমালা ধ্যানপরায়ণ ঋষির মত দণ্ডায়মান;—শোভা আরও বেড়ে গেছে, সারি সারি অগণিত তাল আর নারিকেল-কুঞ্জের নয়ন তৃপ্তিকর দৃশ্যে! আমার সুধুই মনে পড়তে লাগল অমর কবি কালিদাসের সেই অমর বর্ণনা—তমালতালীবনরাজিনীলা।

কিন্তু এ কবিত্ব বেশীক্ষণ টিকল না, ধিরাজকুমারের কক্ষ হতে তাঁর ভৃত্য চা রুটি প্রভৃতি নিয়ে হাজির হলেন। তখন তাড়াতাড়ি হাতে মুখে জল দিয়ে চায়ের সদ্ব্যবহার করা গেল। সারারাত্রি গাড়ীর ঝাঁকুনীতে সুনিদ্রা হয় নাই, অথচ এতটা পথ যে কোন্ দিক দিয়ে পার হোলো, তাও জান্তে পারিনি; এ সময় এক পেয়ালা চা—আঃ কি আরাম!

প্রায় সাড়ে ছয়টার সময় গাড়ী ছাড়ল। সেই মধুর গমন, সেই আট-দশটা ষ্টেসন পার হয়ে গাড়ীর বিশ্রাম। বিজয়নগ্রামে যখন গাড়ী পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় বারটা। এর পূর্ব্বেই আমরা স্নান শেষ করে নিয়েছি। সঙ্গীরা রেষ্টুরাণ্ট কারে খেতে গেলেন, আমার ব্যবস্থা সেই পূর্ব্বরাত্রির মত। রামেশ্বরের ভাণ্ডার অফুরন্ত, নন্দলালেরও তাই—আমার ভাবনা কি? দুই বাড়ীর দুই অন্নপূর্ণা এই দরিদ্র, অন্নাভাবগ্রস্ত বৃদ্ধের জন্য থরে থরে সুখাদ্য সাজিয়ে দিয়েছেন। এই বৃদ্ধ বয়সে এ সব উপাদেয় দ্রব্যের সদ্ব্যবহার আর পুষিয়ে ওঠে না।

এখান থেকে গাড়ী ছেড়ে যেখানে থামবে, তার নাম ওয়াল্টেয়ার।

এইখানেই শ্রীমান নন্দলাল আমাদের সঙ্গ ত্যাগ করবেন। এই ওয়াল-টেয়ারের এ-পাশের ষ্টেসনের নাম সীমাচলম্। এখানে মাদ্রাজ মেল থামে না, একেবারে ওয়াল্টেয়ারে যায়। এই সীমাচলম্ হইতেই অধিকাংশ গ্রাম ও সহরের নামের শেষে 'ম্' যুক্ত হতে আরম্ভ হয়েছে। দাক্ষিণাত্যে অনেক স্থানের নামের শেষেই এই 'ম'। শব্দশাস্ত্রে আমার পাণ্ডিত্য মোটেই নেই, সুতরাং এই ম অন্ত নামের বহুলতার কারণ আমি নির্দেশ করতে পারব না, হয় ত পুঁথিপত্র ঘাটলে কিছু হদিশ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু তাহলে আর ভ্রমণবৃত্তান্ত হবে না, প্রত্নতত্ত্ব হয়ে পড়বে।

সীমাচলে আমাদের রেল গাড়ী থামল না। জানালা দিয়ে সীমাচলের যে দৃশ্য দেখলাম, তা অতি মনোরম। পাহাড়ের পাশে ছোট গ্রাম, তাতে অনেকগুলি সাদা দেওয়ালওয়ালা খড়ের ঘর, মাঝে মাঝে এক একটা পাথর কি ইটের তৈরী বাড়ী মাথা উঁচু করে গ্রামখানির পাহারা দিচ্ছে, অদূরে পাহাড়। পাহাড়ের উপর একটা ছোট মন্দির দেখা যাচ্ছিল, মন্দিরে যাবার সিঁড়ি পাহাড়ের গা-বেয়ে উঠেছে। ইচ্ছা করতে লাগল, গাড়ীখানি যদি এখানে খানিকক্ষণ থামে, তা হ'লে এই বৃদ্ধ বয়সেও একদৌড়ে ঐ সিঁড়িগুলি ভেঙ্গে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে মন্দিরটা দেখে আসি। কিন্তু, তা আর হোলো না, গাড়ী রেল ছুটে গিয়ে একেবারে ওয়াল্টেয়ার দাখিল হোলো। আমাদের সঙ্গী শ্রীমান নন্দলাল সেখানে নেমে পড়লেন, যাবার সময় বলে গেলেন যে, যদি ওয়াল্টেয়ার ভাল না লাগে, তা হলে দুই একদিনের মধ্যে তিনি মাদ্রাজ অঞ্চলে চ'লে যাবেন।

এই ওয়াল্টেয়ারই বেঙ্গল নাগপুর রেলের এদিকের শেষ ষ্টেসন। এখান থেকে ছোট একটা লাইন ভিজিগাপটম গিয়েছে, আর একটা বড় লাইন মাদ্রাজ গিয়েছে। সে রেলপথের নাম মাদ্রাজ ও দক্ষিণ মারাঠা রেলওয়ে কোম্পানী লিমিটেড (Madras and Southern Mahratta

Railway Co. Ltd.)। অন্য রেল কোম্পানী বলে আমাদের গাড়ী বদল করতে হোলো না, আমাদের ঐ গাড়ীই মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাবে।

ওয়ালটেয়ারে যখন গাড়ী পৌছিল, তখন রেলের সময় বারটা তিপ্পান্ন মিনিট। প্রায় এক ঘণ্টা এখানে গাড়ী রইল। শুনলাম, ওয়ালটেয়ার সহর ষ্টেসন থেকে দূরে, দেখেও তাই বোধ হোলো। ষ্টেশনের নিকটে সুধু রেলের বাড়ীঘর, কারখানা দেখা গেল, পাহাড় দৃষ্টিরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন,- দূরের সহর দেখা গেল না। এই স্থানটা খুব স্বাস্থ্যকর ব'লে জাহির হয়ে গিয়েছে। শুনেছি যত থাইসিসের রোগী, সব ওয়াল্-টেয়ারে এসে বাসা বাঁধে, অনেকের না কি রোগ সেরে গেছে এখানে এসে, তাই এখানকার নাম ডাক বেড়েছে। ভিজিগাপটম ওয়াল-টেয়ারের কাছেই এত বড় নামটাকে সংক্ষেপ করে বলা হয় ভাইজাগ্।

ওয়ালটেয়ার থেকে গাড়ী ছাড়ল প্রায় দুইটার সময়। এইবার মাদ্রাজ অঞ্চলে পড়া গেল, তাল আর নারিকেল গাছ ক্রমেই বাড়তে লাগল, যে দিকে চাই সুধু তাল গাছ আর নারিকেল গাছ। গাড়ী দুই চারটা ষ্টেশন পার হয়ে একেবারে শ্যামলকোটে উপস্থিত হোলো। এইখান থেকে একটা শাখা লাইন কোকনাদ বন্দর পর্য্যন্ত গিয়েছে। কোকনাদ সহরের নাম নানা কারণে বিখ্যাত, বিশেষতঃ এখানে খুব ভাল চুরুট পাওয়া যায় বলে বহুকাল থেকে শুনে আসছি। শ্যামলকোট থেকে কোকনাদ মোটে যখন দশ মাইল পথ, তখন শ্যামলকোটে নিশ্চয়ই ভাল চুরুট পাওয়া যাবে, এই মনে করে রামেশ্বরকে চুরুট দেখতে বললাম। সে নিয়ে এল 'পয়সামে তিন চুরুট'—খুব কড়া, একেবারে বিড়ি-জাতীয়।

অপরাহ্ণ সাড়ে ছয়টার সময় আমাদের গাড়ী রাজমন্দ্রীতে পৌছিল। সেকালে যখন ভূগোলসূত্র পড়েছিলাম, তখন স্থানটার নাম পড়েছিলাম রাজমহেন্দ্রী, এখন দেখি 'হে' নেই, কিন্তু রাজমন্দ্রী অপেক্ষা রাজমহেন্দ্রী

নামই ত ভাল। এই রাজমন্দ্রীর পরের ষ্টেসনই গোদাবরী। রাজমন্দ্রী আর গোদাবরী বল্‌তে গেলে একই সহর, দুই ষ্টেসনের দূরত্ব দুইমাইল মাত্র। গোদাবরী ষ্টেসন একেবারে গোদাবরী নদীর ধারেই। প্রকাণ্ড রেলের সেতু। গোদাবরী নদীতে স্নানতর্পণ করলে মহাপুণ্য লাভ হয়। আর তার প্রমাণও রাজমন্দ্রী ষ্টেসনে পাওয়া গেল। একদল পাণ্ডা এসে আমাদের আক্রমণ করল। এরা সেতুবন্ধ-রামেশ্বর ও গোদাবরী, এই দুই স্থানেরই পাণ্ডাগিরি করে। তারা আমাদের চেপে ধরল রামেশ্বরের পাণ্ডাগিরি করবার জন্য। আমি কি করি, আমাদের সঙ্গী শ্রীমান রামেশ্বরকে দেখিয়ে বল্‌লাম, এই দেখ, আমাদের সঙ্গে সশরীরে রামেশ্বর রয়েছেন, আমাদের এই রামেশ্বরই তীর্থ। তারা বেগতিক দেখে 'গঙ্গেচ যমুনাশ্চৈব গোদাবরী সরস্বতী' শ্লোক আউড়ে গোদাবরী তীর্থের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করতে আরম্ভ করল এবং সেই সন্ধ্যাবেলা গোদাবরী ষ্টেসনে নেমে পরদিন প্রাতঃকালে গোদাবরীতে স্নান ও তীর্থকার্য্য শেষ করে অক্ষয় পুণ্য অর্জ্জন করবার প্রলোভন দেখাতে লাগল। গোদাবরী নদীর তীরে অতি সুন্দর ধর্ম্মশালায় আমাদের দোকান করে দেবে, আমাদের কোন কষ্ট হবে না, এ সকল কথা জানাতেও ত্রুটী করল না। কিন্তু, আমরা তাদের হিতবচনে কর্ণপাত না করায় তারা তাদের দিশী ভাষায় আমাদের উপর অভিশাপ বর্ষণ করতে করতে চলে গেল।

তার পরই গোদাবরী ষ্টেসনে গাড়ী এল। ষ্টেসনটী বেশ বড়, রাজমন্দ্রী ষ্টেসনেরই মত। সেখান থেকেই সেতু আরম্ভ। প্রকাণ্ড সেতু—এ পারে গোদাবরী ষ্টেসন, ও-পারে কাভুর ষ্টেসন। সেতুটী দুই মাইল দীর্ঘ। নদীর মধ্যে চড়া পড়েছে; তা হোলেও নৌকা চলাচল করতে পারে। তারপরই রাত্রি হয়ে পড়ল; আমরাও আহারাদি শেষ করে শয়ন করলাম। কোন্ দিক দিয়ে ইলোর, বেজওয়াদা, নেলোর প্রভৃতি পার হয়ে গেল, তা জানতেও

পারলাম না। পোনেরি ষ্টেসনে প্রাতঃকালে আমাদের নিদ্রাভঙ্গ হোলো। সেখানেই প্রাতঃকৃত্য সেরে চা পান করা গেল। তখন প্রায় সাতটা। রেলের আটটার সময় গাড়ী মাদ্রাজে পৌঁছিবে। আমরা তখন বিছানাপত্র বেঁধে প্রস্তুত হলাম। ঠিক আটটার সময় আমাদের গাড়ী মাদ্রাজ ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে পৌঁছিল। আমাদের সঙ্গে লোকজন ছিলই, তবুও বাঙ্গালোর থেকে একজন জমাদার এসে ষ্টেসনে অপেক্ষা করছিল। তার হাতে শ্রীমান ললিতমোহনের চিঠি পাওয়া গেল। তিনি লিখেছেন যে, শ্রীযুক্ত দ্বিরাজকুমার ও ভগবতী যেন মধ্যাহ্নের গাড়ীতেই রওনা হন। তাঁদের জন্য সন্ধ্যার পর বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেসনে সমস্ত বন্দোবস্ত থাকবে; আর আমরা যেন রাত ন'টার গাড়ীতে যাত্রা করি; আমাদের জন্য পরদিন প্রাতঃকালে বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে লোকজন ও গাড়ী থাকবে। তথাস্তু!

মাদ্রাজ

ক্রমাগত চল্লিশ ঘণ্টা মেল-ট্রেণের ঝাঁকুনি খেয়ে ৫ই আশ্বিন সোমবার বেলা সাড়ে আটটার সময় মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেসনে আমাদের গাড়ী পৌছল। এই ষ্টেসনের আগের ষ্টেসনের নাম বেসিন-ব্রিজ ষ্টেসন। আমাদের হাবড়ার কাছে যেমন লিলুয়া ও রামরাজাতলা, এটীও সেই রকমের ষ্টেসন; এখানে যাত্রীদের টিকিট সংগ্রহ করা হয়। আমাদের একেবারে বাঙ্গালোরের টিকিট, সুতরাং টিকিট আর দিতে হোলো না।

আমরা গাড়ীর মধ্যেই আমাদের মাদ্রাজের প্রোগ্রাম ঠিক করে ফেলেছিলাম। প্রাতরাশ—যাকে ইংরেজীতে ব্রেক-ফাষ্ট বলে, তার ব্যবস্থা সাত দিন আগেই কলিকাতা থেকে শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বাহাদুর ঠিক করে রেখেছিলেন, অর্থাৎ বেলা সাড়ে এগারটার সময় আমরা মাদ্রাজের সর্ব্বপ্রধান ভোজনাগার কনেমারা হোটেলে ব্রেক-ফাষ্ট করব। কে একজন রসিক লোক ব'লেছিল যে, প্রাতঃস্নান সে কিছুতেই বাদ দেয় না, তা বেলা একটাতেই হোক আর দুটাতেই হোক। আমাদের ব্রেক-ফাষ্টও সেই রকমই হোলো।

আমরা স্থির করেছিলাম যে, ষ্টেসনে নেমেই আমরা সমুদ্রে স্নান করতে যাব, জিনিষপত্র সব ভৃত্যদের জিম্মায় ষ্টেসনে থাকবে। তাই গাড়ীর মধ্যেই আমরা সমুদ্র-স্নানের কাপড়-চোপড় একটা সুট-কেসে নিয়েছিলাম। এর থেকে যিনি মনে করবেন যে, সাহেবরা সমুদ্রে স্নান করবার জন্য যে পোষাক ব্যবহার করেন, আমাদের সকলের সঙ্গেই সে সব ছিল, তাঁর ভুল হবে; শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার ও শ্রীমান ভগবতীর সাহেবী
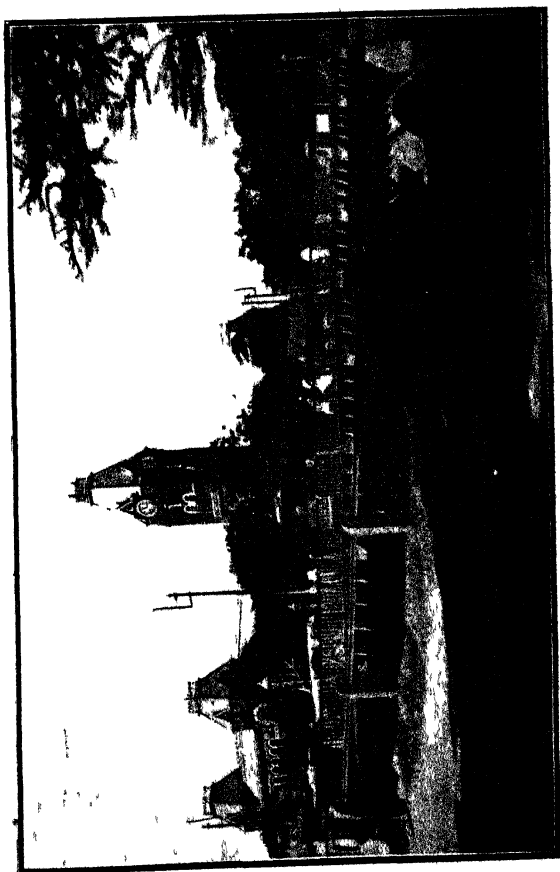
পোষাক ছিল ; রামেশ্বরের আর আমার সেই সনাতন ধুতি আর গামছা। শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার তা ছাড়া সঙ্গে নিলেন তাঁর ক্যামেরা। ষ্টেসনে কনেমারা হোটেলের লোকেরা আমাদের জন্য বড় একখানি মোটর হাজির রেখেছিল। আমরা গাড়ী থেকে নেমেই সেই মোটরে গিয়ে উঠ্‌লাম; ভৃত্যেরা জিনিষপত্র নামাতে লাগ্‌ল।

যাত্রী আমরা চারজন, আর মোটরচালক। আমি একজন চাকরকে সঙ্গে নিতে বল্‌লাম। ধিরাজকুমার বল্‌লেন 'তার দরকার কি? আমরা কি এমনই অকর্ম্মণ্য যে নিজেরা নেয়ে কাপড় ছাড়তেও পারব না।' তিনি যখন পারবেন, তখন আর কথা কি ; আমরা ত ও-সব কাজ নিজেরাই করে থাকি।

আমাদের মোটর বোধ হয় একটু ঘোরা রাস্তায় চল্‌ল, কারণ, পরে দেখেছি যে, সেন্ট্রাল ষ্টেসন থেকে সমুদ্রতীরে যেখানে সকলে স্নান করেন, সেখানে যেতে হ'লে হাইকোর্টের সুমুখ দিয়ে না গেলেও চলে ; সোজা রাস্তা আছে। যাক্, আমাদের মোটর আইন-সঙ্গত দ্রুতবেগে চল্‌তে লাগল, আর ধিরাজকুমার দেখাতে লাগলেন, এই দেখুন হাইকোর্ট, ঐ বাঁয়ে চেয়ে দেখুন জেনারেল পোষ্ট-আফিস, ঐ সুন্দর বাড়ীটা ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, এইটা মেরিণা, চেয়ে দেখুন—এমন সুন্দর রাস্তা আপনার চৌরঙ্গীও নয়, ঐ দেখুন প্রেসিডেন্সি কলেজের বাড়ী, এটা ছেলেদের হোষ্টেল। আমি কিন্তু তখন চোখ বুজে সমুদ্রের স্নিগ্ধ বাতাসে শরীর জুড়িয়ে নিচ্ছিলাম। মনে মনে হাসছিলাম এই ভেবে যে, যে সব গ্লোব-ট্রটার অর্থাৎ ভূপর্য্যটক আমেরিকা থেকে পনর দিনের মেয়াদে এসে চট্‌পট ভারতবর্ষের সব জায়গা দেখে গিয়ে ঘরে ব'সে বড় বড় বিবরণ সংযুক্ত বই লেখে, তারা এই আমারই মত দ্রুতগামী মোটরে ব'সে চোখ বুজে সব দেখে যায়।

বড় রাস্তা দিয়ে কিছু দূর গিয়ে ধিরাজকুমার বল্‌লেন, ঐ যে ব্রিজ

দেখছেন, ঐটে পার হলেই আমরা আদিয়ারে পৌছিব। তখন আর আমি চোঁখ বুজে থাক্‌তে পারলাম না। আদিয়ারের নাম যে সর্ব্বদা শুনি ; সেখানেই যে থিয়সফিক্যাল সোসাইটির প্রধান কেন্দ্র, সেখানেই যে রামকৃষ্ণ মিশনের বড় আশ্রম। সুতরাং শরীরের জড়তা টেনে ফেলে দিয়ে চোখ চাইলাম। তখন মোটর ব্রিজের উপর পৌছে নাই। ধিরাজকুমার বল্‌লেন, ঐ যে দূরে গীর্জ্জাটা দেখ্‌ছেন, ঐটে সেণ্ট থোম গীর্জ্জা। এ নাম যে ইতিহাসে পড়েছি। এর সঙ্গে যে মাদ্রাজের, ইতিহাস জড়িত। কতকাল পূর্ব্বে এক দেবপ্রতিম খৃষ্টান সাধুব পবিত্র অবদানে যে ঐ গীর্জ্জা সুরভিত। সে ইতিহাস, সে কাহিনী যে কণ্ঠস্থ হয়ে আছে। কিন্তু, এখন ত সে সব কথা বল্‌লে চল্‌ছে না,—এখন ধিরাজকুমার বাহাদুরের প্রদর্শিত বায়োস্কোপই দেখি। কিন্তু, এ যে বায়োস্কোপেরও বাড়া—তারা তবুও আধ-মিনিট একমিনিট ছবিটা দেখায় ; কিন্তু এ দ্রুতগামী মোটব অতটুকুও অপেক্ষা করে না। উপায় নাই, তাড়াতাড়ি স্নান সেরে এসে আহাবাদি করে ওঁদের পৌণে একটার গাড়ীতে চড়িয়ে দিতে হবে।

ব্রিজের উপর মোটর উঠ্‌লেই ধিরাজকুমার বল্‌লেন, ঐ যে দেখছেন সুন্দর বাড়ীটা, ঐটে থিয়সফিক্যাল সোসাইটীর বাড়ী। অমন অনেকগুলি বাড়ী ঐ হাতার মধ্যে আছে, বাগানের গাছপালায় ঢেকে বেখেছে। এই দেখুন সোসাইটীর প্রবেশ-দ্বার। বল্‌তে বল্‌তেই চুপ করে আর একদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে বল্‌লেন, ঐ—ঐখানে রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম।

ব্যস্, কেমন সুন্দর দেখা হোলো। এদিকে আমাদের মোটরের বেগ কিন্তু কমছে না ;—ট্রিপ্লিকেন গেল, মাইলাপুর গেল, আদিয়ার গেল,—শেষে একেবাবে পল্লীপথে এসে পৌছিলাম। বাঁয়ে অদূরে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে, অথচ আমাদের গতিবেগ আর থামে না। একটু পরেই একেবারে সমুদ্রতীরে এক নির্জ্জন বালুকাময় স্থানে গিয়ে আমাদের মোটর হাঁফ
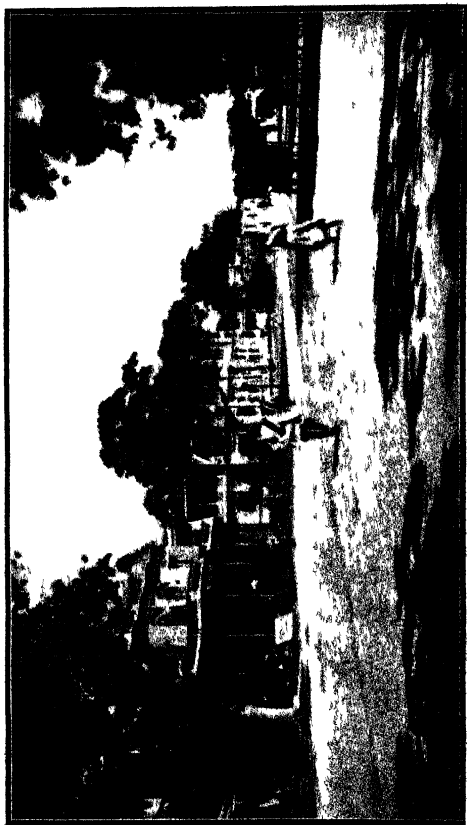
মাউণ্ট রোড

ছাড়ল। সেখানে নেমে বালুকাময় তীরভূমি অতিক্রম করে জলের কাছে যেতে হবে।

আমরা যেখানে নামলাম, তার সুমুখেই একটা অনতি-উচ্চ বালিয়াড়ী ছিল। তাই আমাদের দূর-দৃষ্টি রোধ হয়েছিল। ধিরাজকুমার বল্লেন, ঐ বালিয়াড়ীর ও-পাশেই একেবারে সমুদ্রের উপকূলে অনেকগুলো সুন্দর কাঠের ক্যাবিন আছে। সেখানে কাপড়-চোপড় ছেড়ে স্নান-বস্ত্র প'রে নাইতে যেতে হয়। তার পর ফিরে এসে ক্যাবিনে গিয়ে কাপড় ছেড়ে ও প্রসাধন শেষ করে বাড়ী যেতে হয়। এই স্থানটা নির্জ্জন দেখে মাদ্রাজ মিউনিসিপালিটী এখানেই সমুদ্র-স্নানের আশ্রম করেছেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, সকালবেলা বড়-একটা কেউ নাইতে আসেন না, অপরাহ্নে আসেন।

আমরা বালিয়াড়ী অতিক্রম করে একেবারে সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলাম। এই সেই সমুদ্র! এ ত আমার বহু দিন পূর্ব্বের পরিচিত সমুদ্র নয়। ৪২ বৎসর আগে করাচী বন্দরে যে সমুদ্র আমি দেখেছিলাম, তার কি এতই পরিবর্ত্তন হয়েছে? কৈ, 'মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ত সঙ্গীত ভেসে' আসছে না;—কৈ, সেই ৪২ বৎসর আগের মত ত সমুদ্র কাতরকণ্ঠে ডাকছে না—'ওরে, আয় চ'লে আয় আমার কাছে!' কৈ, এ যে সুধু নীলাম্বর ভৈরব হুঙ্কার! এ যে বাক্যহীন তর্জ্জন গর্জ্জন! সেকালের সমুদ্রের সঙ্গে আমার প্রাণের যোগ ছিল,—সে সমুদ্র ভিতরে বাহিরে আমাকে আকুল করেছিল। আর এখন—এখন সে সমুদ্রে চড়া পড়ে গেছে, সমুদ্র শুকিয়ে গেছে। তাই এতকাল পরে, এই বৃদ্ধ বয়সে মাদ্রাজের সমুদ্র সুধু গর্জ্জনই করতে লাগল—প্রাণের দ্বারে আঘাত করতে পারল না। হায় রে সেদিন, কুদিন হলেও সুদিন সেদিন!

আমাকে হাঁ করে চেয়ে থাকতে দেখে রামেশ্বর বল্লেন, চলুন, ঐ যে

সব ক্যাবিন দেখা যাচ্ছে, ঐখানে কাপড় ছাড়িগে। বেশ, চল। ক্যাবিনগুলির সুমুখে গিয়ে দেখি সবগুলিরই তালা বন্ধ! এই সময় কতকগুলি নুনিয়া বালক সেখানে এসে উপস্থিত হোলো। তাদের কাছে শোনা গেল যে, চৌকীদার এ বেলা আসে না, দুই-প্রহরের পরে আসে।

তখন কি করা যায়। ধিরাজকুমার বল্লেন, তাতে আর কি, ঐ যে তিনচারখানা ছোট নৌকা বালুকার উপর চিৎ হয়ে আছে, ঐ আমাদের ক্যাবিন হোক। এই ব'লে তিনি একখানি নৌকায় লাফিয়ে উঠে নীচে নেমে পড়লেন। তাঁদের কাপড় ছাড়বার একটা আড়াল দরকার; আমার আর রামেশ্বরের সে বাধা নেই, আমরা জামা চাদর নৌকার গায়ে রেখে মাথায় গামছা বেঁধে প্রস্তুত হলাম। আমার কিন্তু ঐ প্রস্তুত হওয়া পর্য্যন্তই দৌড়! আর সবাই ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে নুনিয়া বালকদের সঙ্গে অনেক দূর চলে গেলেন, ঢেউ খেতে লাগলেন। তাঁদের উল্লাস চীৎকারে সমুদ্র-তট মুখর হয়ে উঠ্‌ল। আর আমি—আমি দুই তিনটা ঢেউ মাথায় নিয়ে, এক-রাশ লোণা জল উদরস্থ করে, বালি মেখে, হাঁফাতে হাঁফাতে রণে ভঙ্গ দিয়ে উপরে উঠ্‌লাম। তার পর গায়ের মাথার বালুকারাশি ঝেড়ে ফেল্‌তে কি কম সময় লাগ্‌ল! কিন্তু, আমার সঙ্গীদের জল-খেলা আর কিছুতেই থামে না। আমি যত ডাকি, তাঁদের উল্লাস, তাঁদের চীৎকার তত বাড়ে। এমনই ক'রে প্রায় এক ঘণ্টা তাঁরা স্নান করলেন। তার পর উঠে এসে কাপড় ছেড়ে ধিরাজকুমার একখানি ফটো তুললেন।

মোটরে যখন উঠ্‌লাম, তখন পৌণে এগারটা। এবার আর ঐটে অমুক, ওটা তমুক, তা বলা নেই; সোজা পথে কনেমারা হোটেলে সাড়ে এগারটার মধ্যে পৌঁছিয়ে দেবার আদেশ প্রচারিত হোলো। ঠিক সাড়ে এগারটার সময়ই আমরা হোটেলে পৌঁছিলাম এবং একটুও
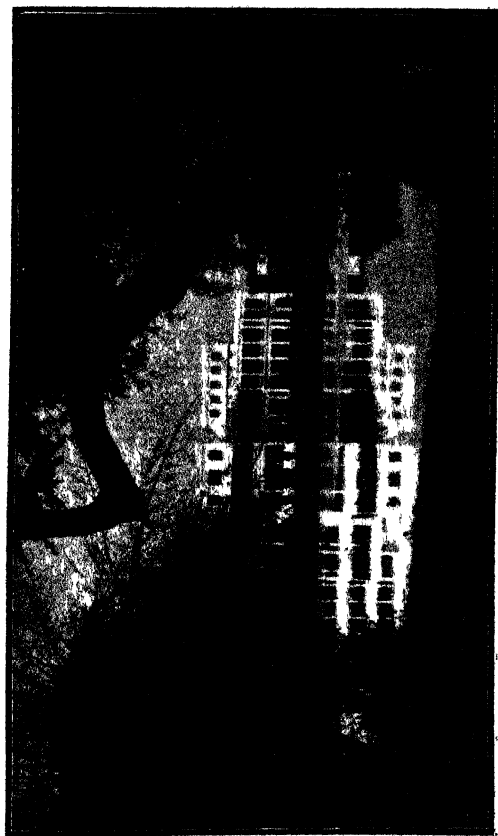
গবর্ণমেণ্ট হাউস—মাদ্রাজ

বিলম্ব না করে সেই দু-প্রহরের সময় প্রাতর্ভোজনে বসা গেল। আমার জন্য নিরামিষের ব্যবস্থা ছিল; অর্থাৎ আমাদের দেশে ভোজ উপলক্ষে নিরামিষাশীদের জন্য যেমন ব্যবস্থা হয়, তাই আর কি। আর সকলের জন্য মৎস্য মাংসের নানাবিধ ব্যঞ্জন, আর যিনি নিরামিষ আহার করেন, তাঁর জন্য অতিরিক্তের মধ্যে হয় একটা আলুর দম, আর বড় বেশী হয় ত একটা ছানার ডাল্‌না! অত বড় কনেমারা হোটেলেও তাই দেখ্‌লাম। দক্ষিণা সবারই সমান; আমার অদৃষ্টে কপি-পাতা সিদ্ধ—একেবারে নিরামিষের চূড়ান্ত। যাক্‌, আধ ঘণ্টা কর্ম্মভোগের পর সেলামী গণে' দিয়ে মোটরে ওঠা গেল। তখন বারটা বেজেছে।

পথে বের হয়ে দূরে একখানি ট্রাম গাড়ী দেখে আমি বলেছিলাম যে, মাদ্রাজের ট্রামগাড়ী কলিকাতার ট্রামগাড়ী অপেক্ষা ভাল। তার পর যখন গাড়া নিকটস্থ হোলো, তখন দেখি রাধামাধব! এ যে একেবারে লক্কড়! আর সেইদিন থেকে এখন পর্য্যন্তও ধিরাজকুমার আমাকে তামাসা করে বলেন যে মাদ্রাজের ট্রাম একেবাবে অতি সুন্দর!

বড় রাস্তায় একটু এসেই ধিরাজকুমার বল্‌লেন, সহর দেখা যত হোক আর না হোক, গাইড-বুক আর কিছু ফটো না নিলে আপনি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিখ্‌বেন কি ক'রে। এই ব'লে তিনি মোটর-চালককে মাদ্রাজের প্রধান পুস্তক-বিক্রেতা ও প্রকাশক হিগেনবোথামেব দোকানে গাড়ী নিয়ে যেতে বল্‌লেন। তাদের সেই প্রকাণ্ড দোকানে নেমে গাইড-বুক ও কতকগুলি ফটো ত কেনা হোলোই, আরও অনাবশ্যক কতকগুলো জিনিষও নেওয়া হোলো। তখনও রেলগাড়ী ছাড়বাব আধ ঘণ্টা বিলম্ব ছিল। ধিরাজকুমার বল্‌লেন, আপনাকে বিলাত যাওয়ার স্থানটা দেখিয়ে আনি। আমরা তখন সেই দ্বি-প্রহরে সমুদ্র-বন্দবে গেলাম। যদি সময় থাক্‌ত, তা হোলে বোটে চ'ড়ে একটু তুফান খেয়েও আসা যেতো। আমরা স্থির

করলাম, আমরা ত আর পৌণে একটার গাড়ীতে যাব না, আমরা যাব সেই সন্ধ্যার পর আটটা পঞ্চান্ন মিনিটের গাড়ীতে; সুতরাং বিকেলে সমুদ্র-তীরে এসে বোটেও চড়ব এবং সহরটাও এক-মেটে রকম দেখে নেব। এই স্থির করে সবাই মিলে ষ্টেসনে এলাম। গাড়ী রিজার্ভ ছিল, জিনিষপত্রও গাড়ীতে তুলে দিয়ে ভৃত্যেরা অপেক্ষা করছিল। পাঁচ মিনিট পরেই গাড়ী ছেড়ে দিল। পর-দিন প্রাতে পুনরায় সাক্ষাৎ হবে ব'লে অভিবাদন করে আমি আর রামেশ্বর ষ্টেসনের বিশ্রামাগারে গেলাম; এবং বার আনা ফি দিয়ে আমাদের মালপত্র ষ্টেসনের কর্ম্মচারীদের হেপাজতে রেখে ষ্টেসনের বাহিরে এলাম এবং ঘণ্টা-হিসাবে একখানি ফিটন ভাড়া করে কোচম্যানের হস্তে আত্মসমর্পণ করা গেল। তাকে বলা হোলো, সহরের যা যা দেখ্‌বার আছে, বিশেষতঃ যে সব পুরাতন মন্দির আছে, সে সবগুলি দেখিয়ে আমাদের সন্ধ্যার সময় ষ্টেসনে পৌছিয়ে দিতে হবে। সে বল্‌ল "All righ , I will show you every thing অর্থাৎ "বেশ কথা, আমি আপনাদের সব দেখিয়ে আনব।" এখানে মুটে, মজুর, গাড়োয়ান, দোকানদার সবাই ইংরাজী বোঝে ও ইংরাজীতে কথা বলে তাই রক্ষা, নতুবা কি যে বিভ্রাট হোতো তা বলা যায় না। এরা হিন্দীও অনেকে বোঝে না, কিন্তু ইংরাজী বেশ বলে।

অতএব, এখন যে ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বল্‌ব, তার জন্য অনেকটা দায়ী কিন্তু আমাদের কোচম্যান। সে যদি মাদ্রাজের মিউনিসিপাল আফিসকে গৌ-খানা বলে পরিচিত করে থাকে, তার জন্য মান-নাশের অভিযোগ কিন্তু কেউ আমাদের বিরুদ্ধে আন্‌তে পার্‌বেন না; অথবা সে যদি রোজারি গীর্জ্জাকে সেণ্ট থোম গীর্জ্জা বলে সনাক্ত করে থাকে, তা হ'লে বিজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ আমাদের উর্দ্ধতম চতুর্দ্দশ পুরুষের ভোজনের সুব্যবস্থা করবেন না, এ কথা ব'লে রাখ্‌ছি। আর আমাদের পক্ষেও একটা বলবৎ
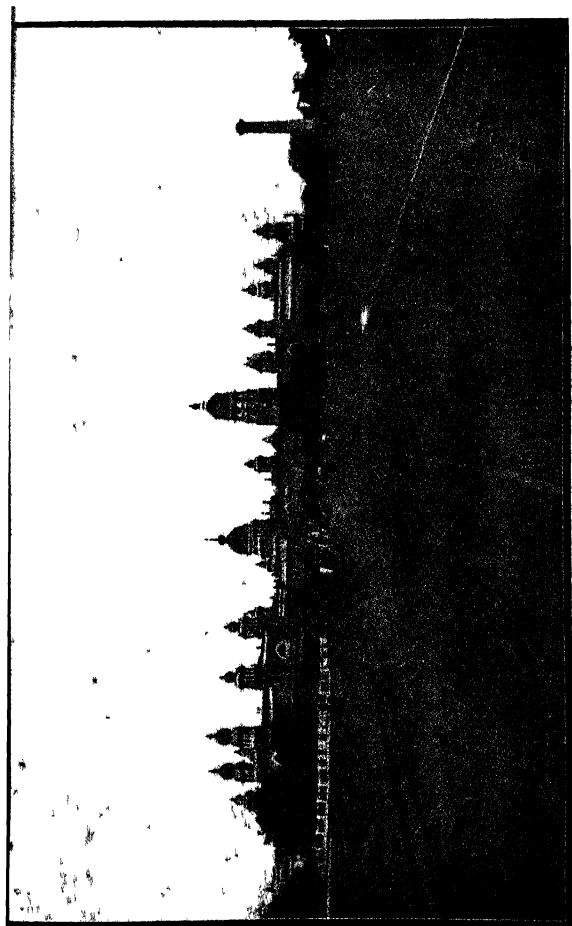
নজীর আছে।' নিরক্ষর পল্লী চৌকীদারের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে যদি এত বড় প্রতাপশালী গবর্ণমেণ্টের কমিউনিক বে'র হতে পারে এবং তদনুসারে রাজ্যশাসন অপ্রতিহত গতিতে চল্‌তে পারে, তখন ইংরাজী-বল্‌নেওয়ালা ফিটন-গাড়ীর কোচম্যানের বাক্য ধ্রুব সত্য বলে গ্রহণ করতে রাজভক্ত ব্যক্তি মাত্রই বাধ্য।

যাক্ সে কথা। আমরা দেড়টার সময় ফিটনে সওয়ার হলাম। সেই সময় আমার সঙ্গী প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ হুকুম করলেন যে সর্ব্বাগ্রে এখানকার সরকারী আর্ট-স্কুলে যেতে হবে। আর্টিষ্টের পক্ষে এ আদেশ প্রদান সর্ব্বাংশে শোভন বলে তাঁর আদেশই বহাল রাখা গেল। কিন্তু আর্ট-স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, বাড়ী বন্ধ। রামেশ্বর তবুও গেট পার হয়ে ভিতরে গেলেন, যদি প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা হয়। কিন্তু তিনিও বাসায় ছিলেন না। সুতরাং এ যাত্রায় চিত্রশালা দর্শন আমাদের ভাগ্যে হোলো না।

আমি তখন বল্‌লাম যে, এখন এখানকার যেটি প্রধান দেবমন্দির, সেখানে যাওয়া যাক্; মন্দির দেখা হ'লে তার পরে আর সব দেখা হবে। সারথি তদনুসারে আমাদিগকে 'পার্থসারথি' মন্দিরে নিয়ে গেল। এইখানে একটী কথা বলে রাখি। আমরা আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে মহেশ্বর, দুর্গা ও শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম পড়েছি; কিন্তু আমাদের দেশে সে সব নাম দিয়ে দেবতা প্রতিষ্ঠিত হতে দেখি নাই, গুটি কয়েক চল্‌তি নামেই আমাদের দেশে দেব-দেবীর নামকরণ এবং প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মাদ্রাজ অঞ্চলে এসে দেখ্‌লাম যে, দেব-দেবীদের সহস্র নামই এদেশে রক্ষিত হয়েছে, এই 'পার্থ-সারথি' নামই তার একের নম্বর নিদর্শন। এই প্রকাণ্ড মন্দিরটী মাদ্রাজের ত্রিপ্লিকেন মহাল্লায় প্রতিষ্ঠিত। পার্থ-সারথি যে শ্রীকৃষ্ণ, সে কথা আর বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকাদের ব'লে দিতে হবে না। মন্দিরের

চারিদিকে উচ্চ প্রাকার ; তার গোপুরম্ বা প্রবেশ-দ্বার প্রকাণ্ডকায়—একেবারে অভ্রভেদী ; আর তার উপর কারুকার্য্য কি সুন্দর ! এই শ্রেণীর মন্দির আমি এই প্রথম দেখলাম, কাজেই আমার বিস্ময়ের অবধি রইল না। কিন্তু, পূর্ব্বেই শুনেছিলাম, আরও দক্ষিণে যে সব মন্দির আছে, তার কাছে পার্থ-সারথি মন্দির নগণ্য। যখন সে সব দেখ্‌ব, তখন গণ্য কি নগণ্য তার বিচার করা যাবে, এখন কিন্তু এই মন্দিরটীকেই অগ্রগণ্য মনে করে, মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেই পার্থ সারথির নাম স্মরণ করে প্রণাম করলাম। মন্দিরের মধ্যে দেখ্‌লাম শ্রীকৃষ্ণ একাকী নেই, তাঁর সঙ্গে আছেন রুক্মিণী, বলরাম, সাত্যকি, স কর্ষণ ও অনিরুদ্ধ। পার্থ সারথির বক্ষদেশে এখনও শরাঘাতের চিহ্ন বর্তমান আছে। মূর্ত্তিগুলি কিসের তৈরী, তা আমার মত পণ্ডিতের অনুসন্ধানযোগ্য নহে, তবে ইহা যে প্রচলিত পঞ্চলৌহে প্রস্তুত নহে, তা দেখেই বুঝতে পারা গেল।

এই মন্দির দেখা হয়ে গেলে, সেই বিস্তৃত প্রাকারের মধ্যে আরও যে সব ছোট বড় মন্দির আছে, সেগুলি দেখতে গেলাম। বেলা তখন আড়াইটা বেজে গেছে। সে সময় দেবদেবীরা এবং তাঁদের পরিচর্য্যাকারীবৃন্দ সব লহ বিশ্রামসুখ উপভোগ করছেন, সুতরাং অনেকগুলি মন্দিরই [illegible] রে। শুন্‌লাম শ্রীরঘুনাথ, শ্রীরামচন্দ্র ও বরদারাজবিগ্রহ ভিন্ন ভিন্ন মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে একটী সরোবর আছে, তাহার নাম কৈরবেণী সরোবর। এ কথাটার অর্থ আমি জানি না। সরোবরটী বেশ বড়, আগাগোড়া সিঁড়ি বাঁধানো, যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই নামতে পারা যায়। জল কিন্তু কৃষ্ণবর্ণ। দেখে বোধ হয়, পল্লীর লোকেরাই যথেচ্ছ ব্যবহার করে জল নষ্ট করেছে এবং এখনও করছে। এত বড় সরোবর, তাতে কিন্তু মাছ নেই, মাছ জন্মেই না। শোনা গেল, অতি পূর্ব্বকালে এই সরোবরে যথেষ্ট মাছ ছিল। ইহার তীরে একজন সাধু তপস্যা করতেন। মাছগুলির

পার্থ-সারথি মন্দির
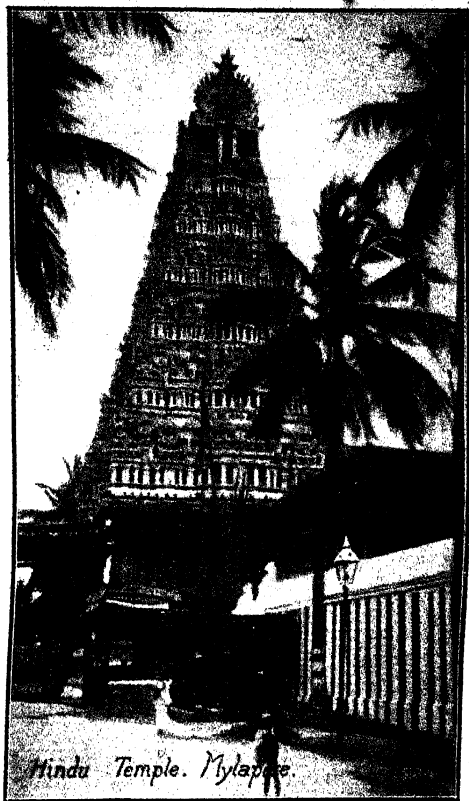
p০।८। এখানেই সেই সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টান ঋষি সেণ্ট থোমের মন্দির এখনও বিরাজমান।

এই কাপালিশ্বর মন্দির অতি পুরাতন, দেখ্‌তেও অতি সুন্দর। এই মন্দির সম্বন্ধে একটা পৌরাণিক কাহিনী আছে; তার উল্লেখ এখানে না করলে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য বর্ণনাই অসমাপ্ত থেকে যাবে। এই গ্রামে এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ-দম্পতি বাস করতেন। একদিন ব্রাহ্মণী তাঁর শিশু পুত্রটীকে নিয়ে এই মন্দির-সংলগ্ন পুকুরের তীরে গিয়ে পুত্রটীকে পুকুরেব ধারে বসিয়ে রেখে জলে নেমেছেন। এদিকে ছেলের ক্ষিদে পাওয়ায় সে চীৎকার আরম্ভ করে দিয়েছে। মা ছেলের চীৎকার শুন্‌তে পান নাই; কিন্তু যিনি জগজ্জননী জগদ্ধাত্রী, তিনি যে মন্দিরে অধিষ্ঠিতা ছিলেন; তিনি কি ক্ষুধার্ত্ত শিশুর ক্রন্দন শুনে স্থির থাক্‌তে পারেন? তিনি তখন মন্দির ছেড়ে এসে শিশুকে কোলে নিয়ে স্তন্যপান করিয়ে তাকে শান্ত করে যান। এমন মায়ের স্তন্যপীযূষধারা যে শিশুর ক্ষুধা শান্তি করে দিল, সে শিশু কি সামান্য ভাগ্যবান্! তার হৃদয়ের মধ্যে যে অমৃতের উৎস প্রবাহিত হোলো! সে ত আর মানব-শিশু থাকল না! এই ব্রাহ্মণ বালকের নাম সাধু শৈব সম্ভাণ্ডার। শিশু ক্রমে বড় হতে লাগল, তার মধ্যে অলৌকিক শক্তির বিকাশ হতে লাগল। সে তখন গৃহ ত্যাগ করে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করে বেড়াতে লাগ্‌ল। সে গান গেয়ে দেবী-মাহাত্ম্য প্রচার করে বেড়াতো। এক দিন মহেশ্বর প্রসন্ন হয়ে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। সাধু সম্ভাণ্ডার তিরুকোলাক্কা মন্দিরে মহেশ্বরের ধ্যান করছিলেন, তখন দেবাদিদেব তাঁর কাছে আবির্ভূত হয়ে তাঁর হাতে এক-যোড়া করতাল দিয়ে আশীর্ব্বাদ করে গেলেন যে, এই করতাল বাজিয়ে গান করে সে জগৎ জয় করবে। সাধু সম্ভাণ্ডার তখন দেশে ফিরে এলেন। এই করতাল বাজিয়ে গান গেয়ে তিনি কত জনের কত

সেভিলা রাজপথ
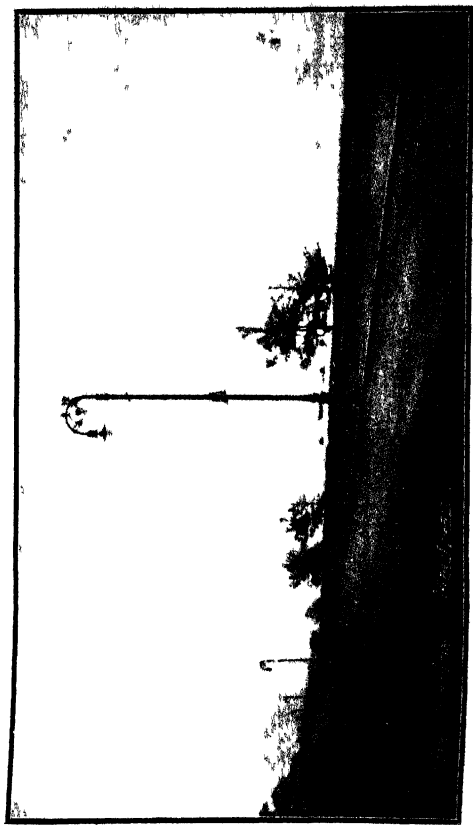
দুরারোগ্য রোগ মুক্ত করেছিলেন। শুনতে পাওয়া যায় যে, একটী চেটী বালিকা অনেক দিন আগে মরে গিয়েছিল! তার হাড় কয়েকখানি শ্মশানভূমিতে পড়ে ছিল! সাধু সম্ভাণ্ডার সেই হাড় ক'খানির পার্শ্বে বসে তাঁর সেই দেব-প্রদত্ত করতাল বাজিয়ে গান করতে করতে চেটী বালিকা আবার বেঁচে উঠেছিল। কাপালিশ্বর মন্দিরে এই সাধুর মূর্ত্তি এখনও পূজিত হয়; তাঁর হাতে এখনও এক যোড়া ধাতু-নির্ম্মিত করতাল আছে।

আমরা এই মন্দির দেখা শেষ করে যখন বাহিরে এলাম, তখন সারথি বললেন যে, একটু দূরে আরও একটা মন্দির আছে; তবে সেটা খুব পুরাতন নয়, কোন এক ধনবান ব্যক্তি অল্প দিন পূর্ব্বে মন্দিরটী প্রস্তুত করিয়ে দিয়েছেন। মন্দিরের নাম সুব্রহ্মণ্য মন্দির।

সারথিকে সেই মন্দিরে যেতে বললাম। অল্পপথ গিয়েই সে আমাদের সেই মন্দিরের সম্মুখে নামিয়ে দিল। হাঁ, মন্দির বটে! আমরা মন্দিরের গোপুরম্ বা প্রবেশমণ্ডপ দেখে অবাক্ হয়ে গেলাম; ভিতরে তখনও প্রবেশ করি নাই। কি যে সুন্দর কারুকার্য্য ঐ গোপুরমের! আধুনিক মন্দির হোলেও তাতে এখনকার চিহ্নমাত্র নেই—সেই সেকেলে ধরণের অভ্রভেদী মন্দির; আর তার গায়ে তেত্রিশ কোটী দেবতার মূর্ত্তি খোদিত। চূড়ার উপর সোণার কলসী। আধুনিকের মত সুধু দেখ্‌লাম, এই গোপুরম্ এবং মন্দিরাদিতে বৈদ্যুতিক আলো সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রাত্রিকালে এই সকল আলো জ্বেলে দিলে একেবারে মন্দিরটী জলজ্বল করতে থাকে। সে সৌন্দর্য্য দেখা আর আমাদের ঘটে উঠে নাই, আর মন্দিরটাও ভাল করে দেখা হোলো না—এখনও যে সহর দেখাই হয় নাই।

মন্দির থেকে যখন আমরা বের' হলাম, তখন প্রায় চারটা। শ্রীমান রামেশ্বর বল্‌লেন, এখানেই চারটা বেজে গেল; সহর দেখা হবে কখন। আমার কিন্তু তখন ভয়ানক ক্ষুধা বোধ হয়েছে, চা-তৃষ্ণাও পেয়েছে। আমি

বললাম, বাবাজি, সহব ঘুবে দেখ্‌বাব এখনও [illegible] সময় আছে ; আপাততঃ কিঞ্চিৎ আহাবেব দবকাব। তারই চেষ্টায় [illegible] যাক্।

সাবথিকে বল্‌তে সে আমাদের নিয়ে গেল এ[illegible] সাহেবী বেস্তোবাঁব দুয়াব-গোড়ায়। আমি বল্‌লাম, না বাপু, এখানে [illegible]। আমরা হিন্দু মানুষ,আমাদেব একটা হিন্দু-আশ্রমে নিয়ে চল। সে তখ[illegible] আমাদের একটা হিন্দু-আশ্রমে নিযে গেল। আমবা গাড়ীতে ব'সেই আশ্রমেব মালিককে ডেকে পাঠালাম। একটী মুণ্ডিত-মস্তক, দীর্ঘ-শিখাধাবী, নগ্নপদ, নগ্নদেহ যজ্ঞোপবীতধাবী যুবক আশ্রম থেকে বেবিয়ে এলে আমি জিজ্ঞাসা কবলাম, আমাদেব কিছু জলযোগেব ব্যবস্থা এখানে হতে পাবে কি না। সে আমাদেব প্রশ্নেব উত্তব দিবাব পূর্ব্বেই প্রতিপ্রশ্ন কবল "Are you Brahmins ?" (আপনাবা কি ব্রাহ্মণ ?) বুঝলাম যে ব্রাহ্মণ ব্যতীত সেখানে অপবেব প্রবেশাধিকাব নেই। আমি সে প্রশ্নেব জবাব দেবাব পূর্ব্বেই সাহেব-বেশধাবী বামেশ্বরপ্রসাদ তাব নেক-টাইযেব নীচে থেকে অধমতাবণ যজ্ঞোপবীত বা'ব কবে দেখিয়ে বলল "Here is ! (এই দেখ" !) যুবক তখন বল্‌ল, "Yes, you are welcome" (হাঁ, আপনাবা আসুন)। ভাগ্যে শ্রীমানেব গলায় যজ্ঞোপবীত ছিল, তাই আমিও নির্ব্বিবাদে সেই ব্রাহ্মণ-আশ্রমে প্রবেশাধিকাব পেলাম। তখন মনে ভাবি অনুতাপ হোলো। হায় ! এ দেশে যে ব্রাহ্মণেব একাধিপত্য, তা জেনেশুনেও আসবাব আগে কায়স্থসমাজেব মেম্বব হযে যদি একগাছা উপবীত ধাবণ কবে আস্‌তাম, তা হোলে আব বামেশ্ববেব উপবীতেব আশ্রয় গ্রহণ কবে এখানে প্রবেশ কবতে হোতো না, আপন জোবেই পৈতে দেখিয়ে গর্ব্ব অনুভব কবতাম। ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি না থাক্‌লে এমন বিড়ম্বনাই ভোগ কবতে হয় !

ব্রাহ্মণেব ভোজনাগাবে ছদ্মবেশে প্রবেশ কবে কেমন যেন একটা অস্বস্তি

ভিক্টোরিয়া পাব্‌লিক হল

বোধ হোলো ; কিন্তু, উপায় ত নেই—কিছু খেতেই হবে ; সুতরাং বিনা বাক্যব্যয়ে একখানি ছোট টেবিলের পাশে দুখানা চেয়ার নিয়ে দুজনে বসা গেল। আমরা কফি খাইনে শুনে তারা চা আন্‌তে গেল ; এদিকে যা খাদ্যদ্রব্য টেবিলে এনে দিল, তা আমার পক্ষে অখাদ্য, কারণ খুব শক্ত দাঁতালো লোক ভিন্ন সে সব আক্রমণ করে কার সাধ্য। রামেশ্বর যুবক, তাতে হিন্দুস্থানী, সুতরাং সেই সব ডা'ল-ভাজা, পাকৌড়ি প্রভৃতি তার কাছে উপাদেয় খাদ্য। আমার দুরবস্থা দেখে আশ্রম কর্ম্মচারী খান চেরেক অমৃতি এনে দিল ; আমার কাছে সেগুলি সত্যসত্যই অমৃতি বলেই মনে হোলো। কোন রকমে জলযোগ শেষ করে তাদের জিজ্ঞাসা করলাম, সন্ধ্যার সময় চারটি ভাত দিতে পারবে কি না। তারা বল্‌ল, রাত সাড়ে আটটার আগে ভাত দিতে পারে না। তখন সেখান থেকে বা'র হয়ে নিকটেই 'আর্য্যভবন' সাইন-বোর্ড মারা আর একটা হোটেলে গেলাম। তাদেরও সেই কথা, সাড়ে আটটার আগে ভাত মিলবে না। অর্থাৎ সে রাত্রিতে অন্নপূর্ণার কৃপা লাভের কোন সম্ভাবনাই নেই। তখন সহরের অন্যান্য দ্রষ্টব্য দেখবার জন্য যাত্রা করা গেল।

সারথির নির্দ্দেশ-অনুসারে প্রথমেই আমরা মাদ্রাজের মিউজিয়ম বা যাদুঘর দেখতে গেলাম। প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে সুন্দর সুদৃশ্য অট্টালিকায় এই যাদুঘর অবস্থিত। আমাদের কলিকাতার যাদুঘর বাহির থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা পাটের গুদাম, কি সাহেবদের হৌস বা আফিস ; বাইরে কোন শ্রীছাঁদই নেই। মাদ্রাজের যাদুঘর কিন্তু তেমন নয়। ভিতরে যাই থাকুক, বাহিরের চাক্‌চিক্য বেশ আছে। যাদুঘরে প্রবেশ করেই প্রথম কক্ষের দেওয়ালে কতকগুলি তৈলচিত্র বিলম্বিত দেখলাম। আমরা অনেকক্ষণ সেই চিত্রগুলিই দেখেছিলাম ; সঙ্গী রামেশ্বরপ্রসাদ সেগুলির সৌন্দর্য্য-বিশ্লেষণ করতে লাগলেন। তার পর ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে চোখ

বুলিয়ে এলাম। কলিকাতার যাদুঘর যারা দেখেছেন, তাঁদের কাছে এখানে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু যে আছে, তা মনে হোলো না; তবে বিশেষজ্ঞদের সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ও অনুসন্ধিৎসার যদি বেশী কিছু মেলে, তা বল্‌তে পারিনে। ভিন্ন ভিন্ন কক্ষে যে সকল আবদালী ছিল, তারা বিশেষ আগ্রহ সহকারে সব দেখিয়ে দিল। তাদের কিছু বক্‌সিস দিতে গেলে তারা সেলাম করে প্রত্যাখ্যান করল।

সেখান থেকে বেরিয়ে তার পাশেই একটা স্বতন্ত্র অট্টালিকায় কনেমারা লাইব্রেরী ও ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউট দেখ্‌তে গেলাম। লাইব্রেরীতে অনেক ভাল ভাল বই আছে। জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, সেখানে বাঙ্গালা বই বা সংবাদপত্র একখানিও নেই। টেক্‌নিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটটী অতি সুন্দর। এখানে সত্যসত্যই কাজ হচ্ছে। অনেক পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এখানে সমবেত হয়ে থাকেন। আমার বিদ্যায় এর বর্ণনা করা কুলাবে না, সুতরাং সে অনধিকারচর্চ্চা না করাই ভাল।

তার পরই আমরা হর্টিকালচারেল উদ্যানে গেলাম। উদ্যানের মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে রাস্তায় এসে পড়লাম। আমাদের সারথি পথের পার্শ্বে একটা গীর্জ্জা দেখিয়ে বললেন, এইটা সেণ্ট জর্জ্জ কেথিড্রাল। তার পর সারথি প্রস্তাব করলেন যে, এইবার মাদ্রাজ উপকূলের সুদৃশ্য সুপ্রশস্ত রাজপথ মেরিণা দেখা উচিত। আমরা বল্‌লাম, সে আমরা প্রাতঃকালেই দেখেছি; হাইকোর্ট, আইন-কলেজ, সমুদ্রের বন্দর, সে সব আমাদের দেখা হয়েছে। সারথি বল্‌লেন, তা হ'লে ভিক্টোরিয়া স্মৃতি-মন্দির দেখতে যাওয়া যাক্। এ কথাটা যদি আগে বল্‌ত, তা হোলে ভাল হোতো, কারণ এই স্মৃতি-মন্দির মিউজিয়মের অনতিদূরেই অবস্থিত।

আমরা তখন স্মৃতি-মন্দির দেখতে গেলাম। অবশ্য, কলিকাতায় লর্ড কার্জ্জন-প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিসৌধের মত কিছু দেখতে পাব, এমন আশা করি নাই।

সৰকাৰী যাদুঘৰ
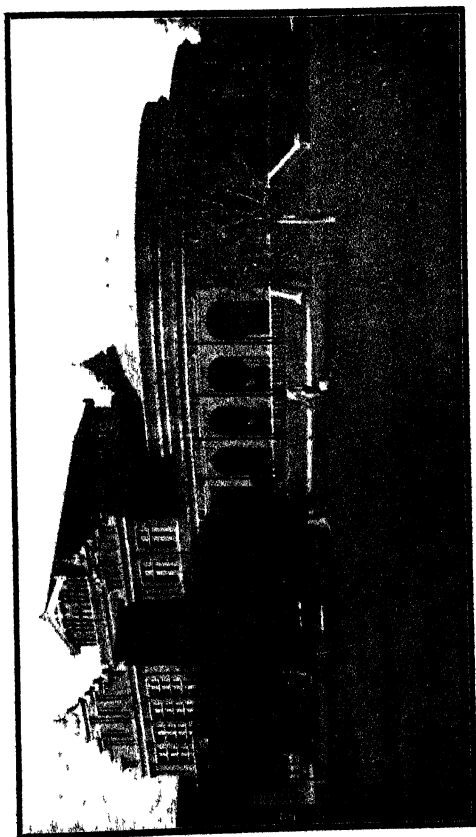
স্মৃতি-মন্দিরের প্রশস্ত হলে প্রবেশ করে দেখি, সেটা আমাদের হোয়াইটওয়ে লেডলয়ের দোকান বল্‌লেও চলে। সত্যিই তাই। নানা রকম দ্রব্য সাজানো রয়েছে; আর প্রত্যেক দ্রব্যের গায়ে টিকিট ঝোলানো আছে। আমি মনে করলাম, হয় ত ঐ সব টিকিটে দ্রব্যের বিবরণ বা ইতিহাস লেখা আছে। কিচ্ছু না মশাই! সে সব টিকিটে জিনিষের দাম লেখা আছে। একজন কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম, সব জিনিষ বিক্রয়ের জন্য সেখানে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। সুতরাং এই স্মৃতি-সৌধকে হোয়াইটওয়ের দোকানের সঙ্গে তুলনা করে আমি সেই মহামহিমময়ী সম্রাজ্ঞীর স্মৃতির প্রতি অভক্তি প্রদর্শন করি নাই; অভক্তি তাঁরাই প্রকাশ করেছেন, যাঁরা এমন পবিত্র স্মৃতি-মণ্ডিত সৌধের মধ্যে দোকান খুলে বসেছেন। নিতান্ত বিরক্ত হয়ে স্মৃতি-মন্দির ত্যাগ করলাম।

হিন্দুর মন্দির, খৃষ্টানের গীর্জ্জা, লাট-বেলাটের বাড়ী, আফিস সবই ত চোখ বুলিয়ে দেখ্‌লাম; এখন মুসলমানের কোন কীর্ত্তি আছে কি না জিজ্ঞাসা করতে সারথি একেবারে লাফিয়ে উঠে বল্‌ল "Of course, there is Shah Aulaiya's Tomb (নিশ্চয়ই, শাহ আউলিয়ার সমাধি-ভবন আছে)।" এই ব'লে সে আমাদের সহরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে তাল-বনের মধ্যে শ্বেত-গম্বুজ-শোভিত পরম পবিত্র সমাধিভবনে নিয়ে গেল। স্থানটী যেমন নির্জ্জন, তেমনই মনোরম। চারিদিকে তাল-গাছগুলি মাথা উঁচু করে এই শান্তরসাস্পদ তপোবনের গাম্ভীর্য্য বৃদ্ধি করছে। শুন্‌লাম, প্রতি বৃহস্পতিবারে শত সহস্র ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান নরনারী বালকবালিকা এখানে সমাগত হয়ে পরলোকগত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রতি বৎসর ৪ঠা এপ্রিল তারিখে মহাত্মার পরলোক-গমনের দিন এখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে। এই মহাত্মা বিজাপুরে জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে আগমন ক'রে এই তালকুঞ্জে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

অসংখ্য লোক তাঁর ধর্ম্মপ্রাণতায় আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এইখানেই অতি বৃদ্ধ বয়সে ১৭৭২ অব্দে তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর কবরের উপর তদানীন্তন কর্ণাটের নবাব ওয়ালাজা বাহাদুর সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়ে দেন। মহাত্মা আউলিয়ার এমন অলৌকিক ক্ষমতা ছিল যে, তাঁহার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে সুপ্রসিদ্ধ হাইদার আলি ও তাঁহার পুত্র টিপু সুলতান ফকিরের ছদ্মবেশে এসে তাঁকে দর্শন ক'রে যান। মহাত্মা আউলিয়ার সমাধি মন্দিরের পূর্ব্বদিকে খানিকটা খালি জমি দেখিয়ে আমাদের সারথি বললেন যে, এই স্থানে কর্ণাটের নবাব ওয়ালাজা প্রথমে সমাহিত হন; পরে তাঁহার দেহাবশেষ ত্রিচিনোপলীতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই থেকে এই স্থানটুকু খালি প'ড়ে আছে।

এই পবিত্র সমাধি-স্থান হ'তে যখন আমরা বের হলাম, তখন ছ'টা বেজে গেছে, ষ্টেসনও অনেক দূর। সুতরাং ফিরবার সময় মাদ্রাজে দুই এক দিন থেকে ভাল করে দেখা যাবে, মনকে এই ব'লে প্রবোধ দিয়ে আমরা ষ্টেসনাভিমুখী হলাম।

ষ্টেসনে এসে দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগারে আশ্রয় লওয়া গেল এবং হাত মুখ ধুয়ে এক এক পেয়ালা গরম চা পান করে একটু বিশ্রাম করব মনে করেছি, এমন সময় একটি মুণ্ডিত-মস্তক, দীর্ঘশিখ, নগ্নপদ ভদ্রলোক এসে আমাকে বিস্মিত করে দিলেন। তিনি টানা-টানা বাঙ্গলায় বল্‌লেন, আপনার নামই কি অমুক। আমার ত ভয়ই হোলো, লোকটা ডিটেক্‌টিভ না কি। কথা নাই বার্ত্তা নাই, একেবারে সোজা বাঙ্গালায় এমন করে এই সুদূর মাদ্রাজে আমাকে আমার মাতৃভাষায় সনাক্ত করে কে? আমাকে নির্ব্বাক্ দেখে তিনি বল্‌লেন যে, তিনি মাদ্রাজেরই অধিবাসী। তাঁর নামটীও আমাকে লিখে দিয়েছিলেন; আমি সে কাগজখানা হারিয়ে ফেলেছি। মোট কথা, তিনি বল্‌লেন এই, যে, তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের

বি-এ উপাধিধারী, এখানকার কোন একটা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় শিক্ষক ; তিনি বেশ বাঙ্গলা জানেন, বাঙ্গালা মাসিকপত্র সব পড়েন ; তাইতে তিনি এমন ভাল বাঙ্গলায় কথা বল্‌তে পারেন। একবার কলিকাতায় এসে শোভারাম বসাকের লেনে তিন মাস ছিলেন। সেই সময় আমাকে দেখেছিলেন। একটা কাজে ষ্টেসনে এসেছিলেন, হঠাৎ আমাকে দেখে কথা বল্‌তে এলেন। লোকটা দেখ্‌লাম খুব বাক্যবাগীশ। আমার কিন্তু মনের খট্‌কা মিট্‌ল না। ভদ্রলোক অনেকক্ষণ অনেক কথা বল্‌লেন ; আমি অতি সংক্ষেপে হুঁ, না, ক'রে সারতে লাগলাম। তার পর ভদ্রলোকটী চ'লে গেলেন। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় গাড়ী যখন প্ল্যাটফরমে এল, তখন আমরা আমাদের নির্দ্দিষ্ট রিজার্ভ কামরায় গিয়ে উঠ্‌লাম। তখনও দেখি সেই মাষ্টার মহাশয় আমাদেরই প্ল্যাটফরমে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এ কি দুর্ভোগ বলুন ত! যাচ্ছি বেড়াতে, কোন কিছুর মধ্যে নেই, অথচ এই ব্যাপার!

গাড়ীতে উঠে দেখি, আমাদের দুইজনের দুইটী আসন রিজার্ভ আছে ; নীচের আর দুইটী আসন আর একজন ভদ্রলোকের নামে রিজার্ভ। একটু পরেই ধুতি-জামা-চাদর চটিজুতা-পরা একটী প্রৌঢ় ভদ্রলোক অনেকগুলি লটবহর নিয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে একটী সুন্দরী যুবতী। ইনি ভদ্রলোকটীর কে, তা কিছুতেই ঠাহর করতে পারলাম না ; জিজ্ঞাসা করাও ভদ্রতা-সঙ্গত নয়। প্রৌঢ় ব্যক্তি তাড়াতাড়ি মহিলাটীর জন্য বিছানা পেতে দিলেন ; দেখলাম একখানি কম্বল পর্য্যন্তও তিনি নিজের শয়নের জন্য রাখলেন না। চাকর বাকর যারা এসেছিল, যুবতীই তাঁর দিশী ভাষায় তাদের উপর হুকুম চালাতে লাগলেন। আমার কি মনে হোলো জানেন? আমার মনে হোলো, যুবতী হয় ভদ্রলোকটীর তৃতীয় পক্ষের গৃহিণী, আর না হয় —।

দূর ছাই, এ কি পরচর্চ্চা! রামেশ্বর সেই প্রৌঢ় ভদ্রলোকটিকে

তাঁদের গন্তব্য স্থানের কথা জিজ্ঞাসা করলে উত্তর পাওয়া গেল, তাঁরা দশহরা উৎসব দেখ্‌বার জন্য মহিসুরে যাচ্ছেন। তা হোলে এঁরা বাঙ্গালোর অবধি আমাদের সঙ্গী। বিপদ এই যে, মহিলার সম্মুখে ব'সে আমাদের দিশী ভাষায় একটু যে হেসে কথা বলাবলি করব, তাতেও সঙ্কোচ বোধ হোলো; কি জানি, আমাদের ভাষা বুঝতে না পেরে তাঁরা যদি অন্য কিছু ভেবে বসেন। কাজেই তখন কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন করা গেল।

যখন ঘুম ভাঙ্গলো, তখন আমরা একেবারে বাঙ্গালোর ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেসনে পৌছেছি। এর পরেই বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসন। সেখানেই আমাদের নামতে হবে। তখন তাড়াতাড়ি বিছানাপত্র বেঁধে নিলাম। একটু পরেই ঠিক ছ'টার সময় সিটি ষ্টেসনে গাড়ী পৌছিল। ষ্টেসনে মোটর নিয়ে রাজ-কন্‌ট্রোলার শ্রীমান স্থরেন্দ্রনাথ রায় উপস্থিত ছিলেন। আমরা মোটরে চড়ে অনতিবিলম্বে আমাদের গন্তব্যস্থান কুমারা পার্কে পৌছিলাম। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর সেই সকালে উঠে এসে বাড়ীর সম্মুখে রাস্তায় আমাদের প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নামতেই তাঁর স্নেহালিঙ্গনবদ্ধ হোলাম—অভিবাদন করবার অবকাশটুকুও এই স্নেহময় পুরুষটী দিলেন না, এতই তাঁর আগ্রহ—এমনই তাঁর ব্যাকুলতা!

বাঙ্গালোর

এইবার বাঙ্গালোরের কথা বল্‌তে হবে। প্রথমে বাঙ্গালোরের কাহিনী বলি। এ স্থানের ইতিহাস বল্‌তে হ'লে মহিষুর রাজ্যেরই ইতিহাস বল্‌তে হয়; আর সে ইতিহাসও দুই এক শত বছরের নয়—বহু শতাব্দীর ইতিহাস। সুতরাং সে চেষ্টা করবার শক্তি-সামর্থ্যও নেই; আর তা করতে গেলে এ ভ্রমণ-বৃত্তান্ত দাক্ষিণাত্যের হিষ্ট্রী হ'য়ে পড়বে। তাই, সে বিস্তৃত বিবরণ মুলতবী রেখে এইখানে আগে বাঙ্গালোর নগরীর কাহিনী বলি, তারপর সাধারণভাবে এই নগরীর একটা ছোটখাট বর্ণনা দিয়ে, ভ্রমণ-বৃত্তান্তের নিয়ম অনুসারে আমার রোজনামচার অনুসরণ করা যাবে।

বহুকাল পূর্ব্বে এই সহরের অস্তিত্বও ছিল না। এখন যেখানে এমন সুন্দর সুরম্য সহর দেখা যাচ্ছে, সেখানে সেকালে ছিল এক গভীর অরণ্য, আর তার অধিবাসী ছিলেন বাঘ ভালুক সিংহ ও অন্যান্য জানোয়ার। এমন ভয়ানক জঙ্গল ও অরণ্য সেকালে এ অঞ্চলে আর ছিল না।

এই সময় এই অরণ্যের প্রান্তে একটা রাজ্য ছিল। সে রাজ্যের নাম বল্‌তে পারব না; কিন্তু রাজার নাম ইতিহাসে লেখা আছে। তাঁর নাম রাজা বীরবল্লাল। এক দিন তিনি লোকজন নিয়ে এই অরণ্যে শিকার করতে এসেছিলেন। একটা বাঘকে অনুসরণ করে তিনি একাকী এই বনের মধ্যে প্রবেশ করে পথ হারিয়ে যান; শিকার ত পান-ই না। এদিকে বেলা অবসান হয়ে এল। রাজা পথ খুঁজতে খুঁজতে আরও গভীর বনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন; তাঁর ঘোড়াটী পথশ্রমে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ল।

এই সময় যদি অরণ্যের মধ্যে একটা ভগ্ন-মন্দিরে 'বিমলা' ও 'তিলোত্তমা'র সঙ্গে সাক্ষাৎ হোতো, তা হ'লে আমার এই ভ্রমণ-বৃত্তান্ত উপলক্ষ ক'রে বেশ একখানি উপন্যাস রচনা করা যেতো। কিন্তু সে সৌভাগ্য মানুষের কদাচিৎ হয়। রাজা বীরবল্লাল এই বিপদ্‌কালে তেমন কিছুরই সাক্ষাৎ পেলেন না; তাঁর অদৃষ্টে জুটলো এক ভাঙ্গা পর্ণ-কুটীর; আর তার অধিবাসিনী এক ছিন্নবস্ত্র-পরিহিতা দরিদ্রা বৃদ্ধা! রাজা সেই বৃদ্ধার আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। বৃদ্ধা বল্‌ল, "তাই ত, কোন রকমে তোমার মাথা দেবার একটু স্থান এই ছোট কুঁড়ের মধ্যে হ'তে পাবে; কিন্তু ঘরে ত খাবার দ্রব্য কিছু নেই, তোমাকে কি খেতে দেব।"

রাজা তখন ক্ষিদের জ্বালায় অস্থির। তিনি চেয়ে দেখ্‌লেন কুটীরের পার্শ্বে এক রাশ বরবটী রয়েছে; বুড়ী বন থেকে ঐগুলি কুড়িয়ে এনে রেখেছিল। ও দেশে বরবটীর নাম 'বেঙ্গালু'। রাজা বল্‌লেন "তুমি ঐ বরবটীগুলো সিদ্ধ করে দেও। তাই আমিও খাব, আমার ঘোড়াটীকেও খাওয়াব।" বুড়ী তাই করল। ক্ষিদের জ্বালায় রাজা সেই 'বেঙ্গালু'-সিদ্ধ খেয়ে বুড়ীর সেই পর্ণ-কুটীরে রাত্রি কাটালেন। পরদিন অরণ্য থেকে বেরিয়ে রাজধানীতে ফিরে এসে, বুড়ীর সেই কুটীরের চারি পাশের অরণ্য কাটিয়ে নগর বসাবার হুকুম দি'লেন এবং তাঁর সেই বেঙ্গালু রাজভোগের কথা চিরস্মরণীয় করবার জন্য এই নগরের নাম দিলেন 'বেঙ্গালুরু'। সেই নাম কালক্রমে সংস্কৃত হ'য়ে এখন 'বাঙ্গালোরে' দাঁড়িয়েছে। 'উরু' শব্দের অর্থ সহর।

এই বাঙ্গালোর সহর মাদ্রাজ থেকে ২১৯ মাইল। এই সহর কোন পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; তা না হ'লেও সহরটী কিন্তু সমুদ্র সমতল থেকে তিন হাজার ফিট উঁচু; তাই এখানে গ্রীষ্মকালেও তেমন গরম হয় না, আবার শীতকালেও তেমন শীত হয় না। এই জন্যই এ সহরের
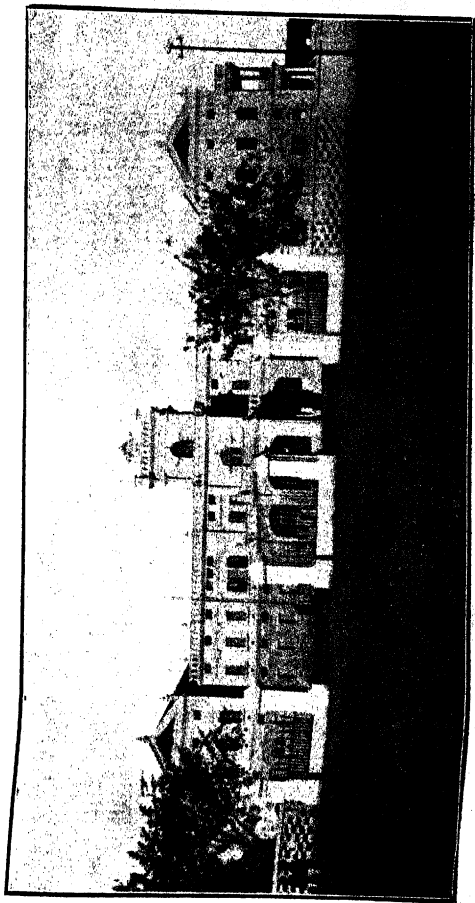
মিণ্টো চক্ষুরোগ-চিকিৎসালয়

এত শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। শুনেছি, অনেক সাহেবলোক কার্য্য থেকে অবসর নিয়ে শেষজীবন এখানেই কাটিয়ে দেন। আর তাঁদের সুবিধার জন্য এখানে বিলাতী সাজসজ্জা অর্থাৎ হোটেল, ক্লাব ইত্যাদির যথেষ্ট ব্যবস্থা আছে।

বাঙ্গালোর দুই ভাগে বিভক্ত। এক ভাগ ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের, তার নাম ক্যান্‌টনমেণ্ট। সাহেবেরা সবাই প্রায় এখানেই বাস করেন। আর একভাগ নেটিভ টাউন বা 'সিটি'। এখানে দিশী লোকের বাস, দিশী হাট-বাজার। ক্যান্‌টনমেণ্টে গোরা-বারিক আছে। তাতে অনেক গোরা সৈন্য নির্ব্বিবাদে আহার-নিদ্রা বিশ্রাম করে দিনপাত করছেন; যুদ্ধ-বিগ্রহও নেই, কোন ঝঞ্ঝাটও নেই;—তাঁরা দিব্বি আরামে সরকারের খরচায় এই সুন্দব সহবে ফূর্ত্তিতে কাটাচ্ছেন।

এই সহরের আয়তন ক্রমেই বাড়ছে। এখন প্রায় বাইশ বর্গমাইল স্থান এই সহর অধিকার করে আছেন। আর আমরা যা দেখে এলাম, তাতে ক্রমেই সহবের পরিধি বাড়তে আরম্ভ করেছে, সঙ্গে সঙ্গে ভাল ভাল বাড়ীঘর তৈরী হচ্চে। আমার ত মনে হয়, শুধু মাদ্রাজ প্রদেশ কেন, বাঙ্গালোরের মত সুন্দর সহর ভারতবর্ষেই অতি কম আছে। সহর দেখলে মনে হয় যেন একখানি ছবি। প্রত্যেক বাড়ীর সংলগ্ন উদ্যান কি পরিপাটি! এখানে যে সব নূতন পল্লী স্থাপিত হচ্চে, সেগুলির ইংরাজী নাম দেওয়া হচ্চে; যেমন—ক্লিভল্যাণ্ড টাউন, রিচ্‌মণ্ড টাউন, ফ্রেজার টাউন ইত্যাদি।

হিন্দু-মন্দিরের কথা বাদ দিয়ে রাখ্‌লে বাঙ্গালোরে দেখ্‌বার মত প্রধান স্থান তিনটী, যথা—কাব্‌বন্‌-উদ্যান, লালবাগ আর পুরাতন কেল্লা। এই তিনটী ছাড়াও নাম করবার মত আরও অনেক বাড়ীঘর আছে; যথা—রাজপ্রাসাদ, ভিক্‌টোরিয়া হাস্‌পাতাল, মিণ্টো-চক্ষু-চিকিৎসালয়, সেণ্ট্রাল কলেজ, সেণ্ট প্যাট্রিক গির্জ্জা, এঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, রিসার্চ্চ ইনষ্টিটিউট

ইত্যাদি। আমাদের প্রবাস-ভবন কুমারা-পার্ককেও এ তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। আমরা কিন্তু এই তিনটী প্রধান দর্শনীয় স্থান ছাড়াও এখানকার প্রধান প্রধান স্থান ও মন্দিরগুলি দেখেছি, আর সেগুলি দেখে যে আনন্দ ও শান্তি লাভ করেছি, সারা বিলাতী সহর দেখেও সে আনন্দ পাই নি। সে কথা আমার রোজনামচা বিবৃতির সময় বল্‌ব। এখন, উপরে যে তিনটী স্থানের কথা বলেছি তারই একটু বিবরণ দিই।

প্যারেড-গ্রাউণ্ডের পশ্চিম দিকে কাব্বন উদ্যান। এ উদ্যানটী এমন সুন্দর যে দেখ্‌লে চোখ জুড়িয়ে যায়। তার পর এ বাগানটী ছোট নয়, আমাদের কলিকাতার ইডেন উদ্যানের মত কুড়ি-পচিশটা বাগান এই কাব্বন-পার্কে গুইয়ে রাখা যায়। মহিশুর গবর্ণমেণ্টের যত আফিস আদালত, সবই এই বাগানের মধ্যে অবস্থিত। এইখানে ব'লে রাখা ভাল যে, মহিশুরের মহারাজা থাকেন মহিশুরে, কিন্তু, তার রাজকার্য্য যা কিছু, সব বাঙ্গালোর থেকেই হয়,—এখানেই মহিশুর গবর্ণমেণ্টের যত কিছু আফিস আদালত, আর সে সবই বিটীস গবর্ণমেণ্টের আফিস আদালতের মত,—সেইভাবে, সেই প্রণালীতে গঠিত ও পরিচালিত। মহিশুর রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী দেওয়ান বাহাদুরও বাঙ্গালোরেই বাস করেন। সে সব কথা পরে বল্‌ছি।

এই সুবৃহৎ বাগানের নাম কাব্বন-পার্ক কেন হোলো, তাই আগে বলি। মহিশুর রাজ্য যখন গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল, তখন ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সার মার্ক কাব্বন (Sir Mark Cubbon) মহিশুরের কমিশনার ছিলেন এবং তাঁরই চেষ্টায় ও যত্নে এ রাজ্যে সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হয়। সেই জন্য, তাঁর স্মৃতিরক্ষাকল্পে এই পরম রমণীয় উদ্যান নির্ম্মিত হয়েছিল। এই বাগানের পূর্ব্ব সীমায় একটা বেশ সুপ্রশস্ত রাজপথ আছে। সেই পথের পার্শ্বে এক প্রান্তে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার এবং আর
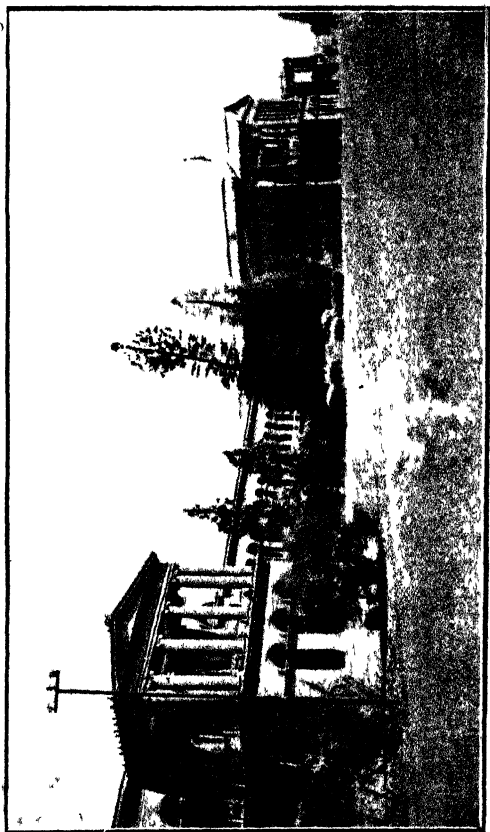
সেক্রেটেরিয়েট গৃহ

এক প্রান্তে সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট যখন যুবরাজ ছিলেন, তখন তিনি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে এসে বাঙ্গালোরে মহারাণী ভিক্‌টোরিয়ার প্রতিমূর্ত্তি উন্মোচন করেছিলেন।

এই কাব্বন-পার্কের অন্য এক দিকে মহিযুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান, প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা সার শেষাদ্রি আয়ার মহোদয়ের স্মৃতি-মন্দির "শেষাদ্রি হল ও পাব্‌লিক্ লাইব্রেরী" আছে; আর এই শেষাদ্রি মন্দিরের সম্মুখেই তাঁহার প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। মূর্ত্তির পাদপীঠে লেখা আছে, স্যার শেষাদ্রি আয়ার ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজ্যের দেওয়ান ছিলেন। বলিতে গেলে, মহিযুর রাজ্যের বর্ত্তমান সমৃদ্ধির জন্য যেমন মহারাজা বাহাদুরকে ধন্যবাদ করতে হয়, তেমনি, এমন কি ততোধিক ধন্যবাদ করতে হয় পরলোকগত দেওয়ান মহাত্মা শেষাদ্রি আয়ারকে! আর কৃতজ্ঞ মহিযুর গবর্ণমেণ্ট ও দেশবাসী আয়ার মহোদয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কৃপণতাও করেন নাই,—শেষাদ্রি মন্দির ও পুস্তকালয়ই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

এই পার্কের অনতিদূরেই 'যাদুঘর' বা মিউজিয়ম। এখানে মৃত জীবজন্তু ও পুরাদ্রব্য ত সংগৃহীত হয়েছে-ই, তা ছাড়া মহিযুর রাজ্যে উৎপন্ন সর্ব্বপ্রকার শস্য ও খনিজ দ্রব্যও রাখা হয়েছে। একটা কাচের আধারে আকবর শাহের শীলমোহরযুক্ত আদেশপত্র, আওরঙ্গজেব বাদশাহ প্রদত্ত সনদ প্রভৃতিও রাখা হয়েছে। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে যখন ব্রিটীশ সেনাপতি শ্রীরঙ্গপটম্ আক্রমণ করেন, সেই সময় টিপু সুলতান ও ইংরাজ পক্ষের সৈন্য-সংস্থান কি ভাবে হয়েছিল, তার একটা মডেলও এই মিউজিয়মে রাখা হয়েছে।

পুরাতন সহরে টিপু সুলতানের দুর্গ ও প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। দুর্গটী অনেকটা স্থান জুড়ে ছিল; এখন সামান্য অংশমাত্র

আছে, বাকী সবটায় মিউনিসিপাল আফিস ও অন্যান্য বাড়ীঘর হয়েছে। এই দুর্গটীর কথা এমন ভাবে বললে ইতিহাসের অবমাননা হয়, সুতরাং খুব সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলছি, আর, তা না সত্যসত্যই বাঙ্গালোরের কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে কাম্পে গৌড়া নামক বিজয়নগর রাজ্যের এ সামন্ত রাজা এখানে একটী মাটীর গড় তৈরী করেন। এ রাজা বীরবল্লালের জঙ্গল পরিষ্কার করে বাঙ্গালুরু গ্রাম প্রতিষ্ঠার অ পরের কথা। তার পর, সপ্তদশ শতাব্দীতে বিজাপুরের আদিলশ সুলতানের সেনাপতি বাঙ্গালোর অধিকার করে শিবাজীর পিতা শাহাজ ইহা জাগীর স্বরূপ দেন। ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে সুপ্রসিদ্ধ হাইদার আলি মহি রাজের নিকট বাঙ্গালোর জাগীর প্রাপ্ত হয়ে পুরানো দুর্গটীকে ভেঙ্গে যে পাথর দিয়ে নূতন দুর্গ তৈরী করান। পরে টিপু সুলতানের সঙ্গে ইংরা গবর্ণমেণ্টের যুদ্ধ বাধলে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক এই দ অধিকৃত হয়। যে স্থান থেকে তিনি টিপুর সৈন্য আক্রমণ করেছিলে সেখানে একটী স্মৃতিস্তম্ভ নির্ম্মিত হয়েছে। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে টিপু এই দুর্গ ফিরে পান, কিন্তু কি জানি কেন, তিনি দুর্গটী ভেঙ্গে দেন। সামা একটু অংশ মাত্র থাকে। তার পরে, মহীশূর রাজ্যের খ্যাত দেওয়া পূর্ণায়া পুনরায় দুর্গটী তৈরী করে দেন। এই দুর্গের মধ্যে যেখানে টিপু সুলতানের মহল ছিল, সে স্থান একখানি ফলকের দ্বারা চিহ্নিত করে রাখা হয়েছে। এই ভগ্ন দুর্গের মধ্যে অন্ধকারাবৃত সিঁড়ি দিয়ে নেমে আমরা একটা প্রকোষ্ঠ দেখতে গিয়েছিলাম। সেই প্রকোষ্ঠের ক্ষুদ্র দুয়ারের সম্মুখে প্রস্তর-ফলকে লেখা আছে—

In this dungeon

were confined

কাম্পে গোঁড়ার প্রস্তর-মূর্ত্তি

Captain (afterwards Sir) David Baird and
many officers prior to their release in
March 1785.

এই যুদ্ধের ইতিহাস দিতে গেলে ব্যাপার ভারি গুরুতর হয়ে পড়বে, সুতরাং সে প্রলোভন সংবরণ করা গেল।

এইবার লালবাগের কথাটা এইখানে ব'লে নিয়ে আমি আমার রোজনামচার আশ্রয় গ্রহণ করব। পুরানো কেল্লা থেকে প্রায় এক মাইল পূর্ব্বে, সহরের এক কোণে, এক রকম বাইরে বল্লেই হয়, লালবাগ উদ্যান। সুপ্রসিদ্ধ হাইদার আলি এই বাগানের পত্তন করেন। এই বাগানের আয়তন প্রায় তিনশত বিঘা। দেশ-বিদেশ থেকে নানা জাতীয় উদ্ভিদ এই বাগানে সংগৃহীত হয়েছে। হাইদার আলির পর তাঁর টিপু সুলতান এই বাগানটীর যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন।
বাঙ্গালোর ইংরাজের দখলে এলো, তখন ১৮
কমিশনর সার মার্ক কাবান এই বাগানটী
হাতে দেন; কিন্তু তাঁদের এই সে
তখন মহিষুর গবর্ণমেণ্ট আবার
এটীকে নিজেদের কর্তৃত্ব
এই বাগানের মধ্যে এ
একটা প্রশস্ত গৃহ
ভারত-ভ্রমণে এ
ক'রে যান। এ
উদ্যেয়ারের এক
উদ্যেয়ার বাহা
করেন এবং

কালীঘাটের কেওড়াতলার শ্মশানঘাটের পার্শ্বে মহারাজের সমাধি ভবন সকলেই দেখেছেন। বাঙ্গালোরের কথা মোটামুটি এক রকম বলা হোলো ; এইবার আমার রোজনামচার অনুসরণ করি।

৬ই আশ্বিন, ২২শে সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার—

পূর্ব্বেই বলেছি, ভোর ছ'টার সময় আমরা বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে নেমে বর্দ্ধমানের শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের প্রবাস-ভবন কুমারা পার্কে উপস্থিত হ'লাম। এই কুমারা পার্ক ভবনটী অতি সুদৃশ্য! বাড়ীটী যে খুব বড়, তা নয় ; কিন্তু কম্পাউণ্ড একটা গ্রাম বললেই হয়। প্রায় চারিশত বিঘা জমি জুড়ে এই কুমারা পার্ক। এটী মহিসুরের ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান ...াকগত সার শেষাদ্রি আয়ার মহাশয়ের বাড়ী ছিল। তিনি ইহা ...ূল্যে মহিসুরের মহারাজাকে বিক্রয় করেন। বাড়ীটী ...লেই হয়। মহারাজাও এখানে বাস করেন না, ...বাড়ীতে থাকেন না। তাই ব'লে যে ...াড়ীটীর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অনেক ...আছে, খবরদারী ...বার জন্য ...জুড়িয়ে য...; কত রকম ...আর বলা যায় না। ...য়েকটী কৃত্রিম ঝরণা ...ছ। ...পর পর মহারাজ ...গেলেন। বড় ...রকমে তাঁদের ...একটা প্রকাণ্ড

কুমারা পার্ক
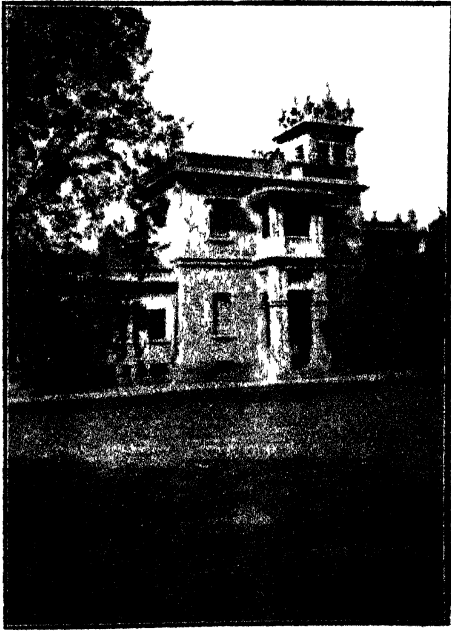
বস্ত্রাবাস খাটানো হয়েছে। মহারাজ আমাদের সেই বস্ত্রাবাসে নিয়ে গেলেন। সেটী এত বড় যে তার মধ্যে একটা যাত্রার আসর করা যেতে পারে। বস্ত্রাবাসটী নানাপ্রকার আসবাবে সজ্জিত করা হয়েছে, মাটীতে পুরু ক'রে খড় পেতে তার উপর উৎকৃষ্ট একখানি সতরঞ্চি পাতা হয়েছে, দুপাশে দুখানি স্প্রিংয়ের খাট, বিছানা, পার্শ্বেই স্নানাদির ঘর। সমস্ত বস্ত্রাবাস, এমন কি স্নানের ঘরগুলিতেও ইলেক্‌ট্রিক আলোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ আমাদের মত গরিবকে কয়েক দিনের জন্য আবুহোসেন পদে বহাল করবার জন্য যা যা দরকার, তার কোন ত্রুটী হয় নাই।

মহারাজ বল্লেন, "এখানে এখন বর্ষাকাল, সর্ব্বদাই বৃষ্টি হয়, এই তাম্বুতে হয় ত কষ্ট হবে। তাই মনে করে ও পাশে একটা ছোট বাড়ীর একটা ঘরও ঠিক করে রেখেছি; আসুন, সেটাও দেখাই।" আমি বল্লাম "না, আর কোথাও যাচ্ছিনে, এই তাম্বুতেই থাক্‌ব।" তিনি কিন্তু ছাড়লেন না, সে ঘরটীও দেখালেন। সেটীও বেশ, কিন্তু তাম্বুর উপরই আমার ঝোঁক পড়ল। কাজেই তিনি তাতেই সম্মত হলেন। আমাদের বড় তাম্বুর পাশেই আর একটা ছোট তাম্বু খাটানো হয়েছে। সেটীতে প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন দাস আড্ডা করেছেন। আমাদের অতি নিকটে থাকবেন বলেই ললিতমোহন প্রাসাদ-কক্ষ ত্যাগ করে এখানে থাক্‌বার ব্যবস্থা করেছেন।

তার পর মহারাজ বল্লেন, "দাক্ষিণাত্য বেড়াবার প্রোগ্রাম তৈরী করে রেখেছি। সবাই মিলে একসঙ্গে ভ্রমণে যাওয়া যাবে। সে প্রোগ্রাম আপনাকে পরে দেখাব, এখন ঘর গৃহস্থালী গুছিয়ে নিয়ে বিশ্রাম করুন। আজ একেবারে খাঁটি বিশ্রাম, কোথাও বেরিয়ে কাজ নেই।" এই ব'লে তিনি চলে গেলেন। তার পরই যিনি যেখানে ছিলেন, সবাই এসে আমাদের বস্ত্রাবাসটীকে হাস্য-কোলাহল ও গল্পগুজবে মুখর করে তুল্‌লেন;

মহারাজকুমারদ্বয় ও শ্রীমান ভগবতীও এসে জুটলেন। আমাদের চাঁদের হাট ব'সে গেল।

সারাদিন এই ভাবেই কেটে গেল। সন্ধ্যার একটু পূর্ব্বে ডাক্তার ফণীন্দ্র বললেন যে, একটু বাস্তা ঘুরে আসা যাক্। তাঁর সঙ্গে আমি ও রামেশ্বর আর সকলের অজ্ঞাতে বে'র হয়ে পড়লাম। আকাশে তখন ঘনঘটা। কিন্তু আমরা মনে করলাম বৃষ্টি আসতে বিলম্ব হবে; ততক্ষণের মধ্যে আমরা একটু ঘুরে আসতে পারব। কুমারা পার্ক থেকে বেরিয়ে কিছুদূর গেলেই ঘোড়দৌড়ের মাঠ। আমরা যখন মাঠের কাছে গিয়েছি, তখন একেবারে মুষলধারে বৃষ্টি। আমরা ভিজতে ভিজতে দৌড়িয়ে বাঙ্গালোরের ইলেক্‌ট্রিক পাওয়ার হাউসের দুয়ারে আশ্রয় নিলাম। প্রায় আধঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন দেখলাম বৃষ্টি ছাড়ে না, তখন ভিজতে ভিজতে যানের খোঁজে রাস্তায় এলাম। বাঙ্গালোর সব বিষয়ে ভাল, কিন্তু এখানে যান প্রচুর নয়। ট্যাক্সি ও ঘোড়া গাড়ীর সংখ্যাও সহরের অনুপাতে বেশী নয়; আছেন শুধু গো ও অশ্ববাহিত পুষ্পরথ, তাঁর এদেশী নাম হচ্চে ঝট্‌কা। সেই বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় ঝট্‌কাও দেখতে পেলাম না'—ট্যাক্সি কি ফিটন ত দূরের কথা। পথের পাশে গাছতলা আশ্রয় করে বেশ ভিজতে লাগলাম। একটু পরেই একখানি ঝট্‌কা পাওয়া গেল। সেই অনিন্দ্য সুন্দর যানে আরোহণ করে ভিজতে ভিজতে কুমারা-পার্কের সদর দুয়ারে এসে গাড়ী ছেড়ে দিতে হোলো; কারণ এই অবস্থায় ঝট্‌কারোহী হয়ে পার্কের মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের বস্ত্রাবাসের কাছে যেতে গেলে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরের সদা-জাগ্রত দৃষ্টি এড়াতে পারা যাবে না, ফলে অনেক ভর্ৎসনা ও বিড়ম্বনা ভোগ করতে হবে। তাই পার্কের প্রবেশ-পথে ঝট্‌কা বিদায় ক'রে দিয়ে আবার ভিজতে ভিজতে চোরের মত, খেলবার মাঠের পার্শ্ব দিয়ে আমাদের বস্ত্রাবাসে ফিরে

পবীপুরনের ত্রিশূল প্রভৃতি
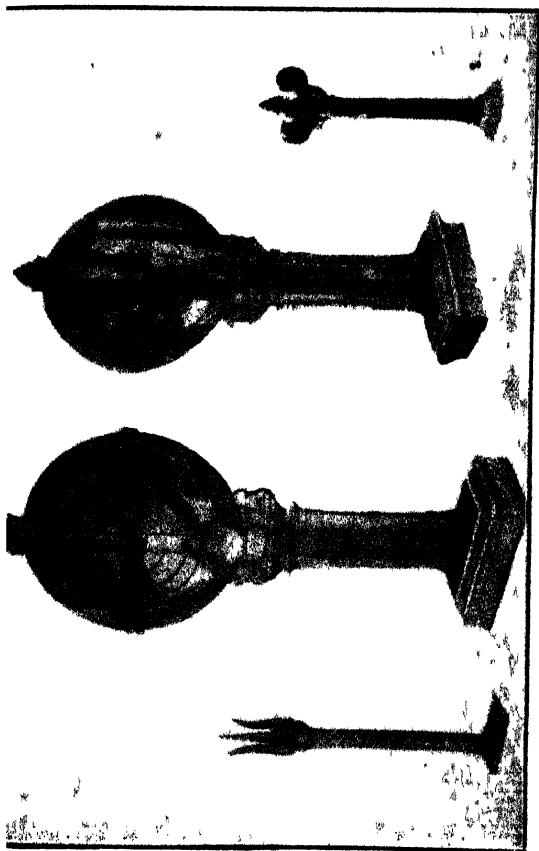
এলাম। তার পর ভিজে কাপড় ছেড়ে দুই পেয়ালা চা খেয়ে তবে স্থির হয়ে বসি।

পূর্ব্বেই বলেছি, আমাদের তাম্বুটা এত বড় যে, তাতে যাত্রার আসর বসানো যেতে পারে। এই দূর দ্রাবিড়ে যাত্রার দল বসানো গেল না বটে, কিন্তু তার বদলে থিয়েটারের আড্ডা সন্ধ্যার পর আমাদের এই প্রশস্ত তাম্বুতে জম্‌ল। মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতমোহন যেমন কাজের লোক, তেমনি আমোদপ্রিয়,—গানবাজনায় তাঁর ভারি সখ। এই বাঙ্গালীহীন স্থানে পূজা কাটাতে হবে ব'লে তিনি আমাদের আসবার পূর্ব্ব থেকেই সীতা নাটকের অংশ-বিশেষ তালিম দিচ্ছিলেন, অভিপ্রায়, পূজার তিন দিনের এক দিন একটা মজলিস করা হবে। নাটোল্লিখিত ব্যক্তিগণও তিনি রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্য থেকেই বেছে নিয়েছেন। এ কয়দিন বোধ হয় এদিক-ওদিকে রিহার্সেল চল্‌ছিল আজ থেকে দাদার ঘরে তাঁদের স্থায়ী আড্ডা হোলো। রাত্রি ৯টা পর্য্যন্ত বেশ আনন্দে কাটানো গেল। তার পর আহার ও শয়ন।

পাছে ভুলে যাই, তাই এইস্থানেই আর একটা ছোট কথা ব'লে রাখি। এই কুমারা পার্ক সর্ব্বাংশে একেবারে সাহেবী হিসাবে সজ্জিত— সেই ড্রয়িং রুম, সেই ডাইনিং রুম—আসবাব পত্রও সব সাহেবী ধরণের, কিন্তু অন্দর মহলে গিয়ে দেখি প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে একটী মঞ্চ—আর তার উপরে বিরাজ করছেন একটী সযত্নবর্দ্ধিত তুলসীবৃক্ষ। ইনি যে প্রতিদিন দীপদর্শন তথা ভক্তের প্রণাম লাভ করেন, তারও প্রমাণের অসদ্ভাব ছিল না। বুঝতে পারা গেল, গৃহস্বামী মহিশুর-মহারাজ পরম হিন্দু এবং তিনি বৈষ্ণব। আমার এ ধারণা যে সত্য, তা পরে জান্‌তে পেরেছিলাম।

৭ই আশ্বিন, ২৩শে সেপ্টেম্বর, বুধবার—

আজ ষষ্ঠী। আমাদের দেশে এক বছরের পরে আজ মহামায়ার আগমন হবে। ভোরেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি শয্যাত্যাগ করে একটা মায়ের আগমনী গান ধ'রে ললিতের তাম্বুতে গেলাম। আমি তার শিয়রে ব'সে আমার এই ভাঙ্গা গলায় গাইলাম—

"সারা বরষ দেখিনি মা, মা তুই আমার কেমন ধারা।
নয়নতারা হারিয়ে আমার অন্ধ হোলো যে নয়ন-তারা॥
এলি কি পাষাণী ওরে, দেখবো তোরে আঁখি ভরে,
কিছুতেই থামে না যে মা, পোড়া এ নয়নের ধারা।"

অনেক দিন পরে, আমার জন্মভূমি হোতে অনেক দূরে এই দাক্ষিণাত্যের প্রান্ত সীমায় ব'সে প্রাণ খুলে মায়ের আগমনী গান করে সত্যসত্যই একটু শান্তি লাভ করলাম, ললিত ও রামেশ্বরের নেত্রেও সজল হয়ে উঠল।

প্রাতঃকালে আর কোথাও যাওয়া হোলো না। অপরাহ্নে একখানি গাড়ী নিয়ে সহর দেখতে বাহির হওয়া গেল। আজ আমরা ক্যানটনমেণ্টের দিকে না গিয়ে সিটির দিকে গেলাম।

প্রথমেই বাজারে উপস্থিত হ'য়ে কাপড়ের দোকানে গেলাম। দোকানদারেরা যে সব শাড়ী দেখালো, সে সবই ষোল হাত লম্বা। এ কাপড় নিয়ে আমরা কি করব,—আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা দশ হাতের উপর যান না। এখানকার মেয়েরা ষোল হাত কাপড়ই ব্যবহার করেন। আমার ত এখানকার মেয়েদের পরন-পরিচ্ছদ বেশ ভাল বোধ হোলো; ষোল হাত কাপড় তাঁরা বেশ গুছিয়ে পরেন; তাতে আবরু অতি সুন্দর ভাবে রক্ষা পায়। এ দেশে একটা জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে।
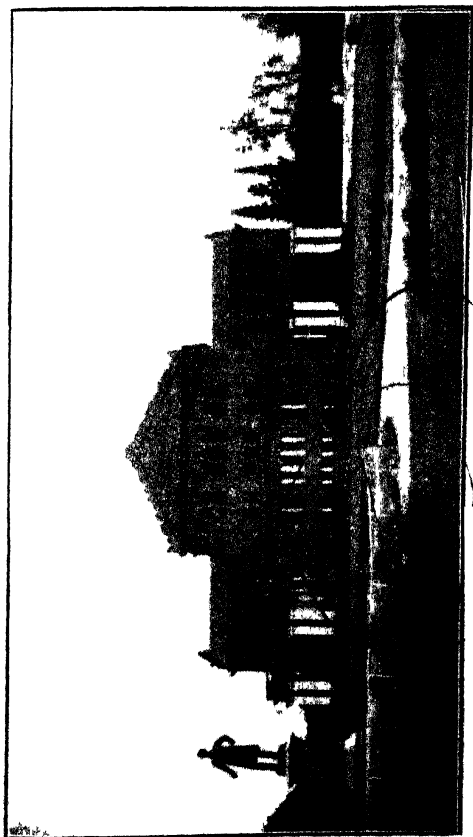
সার শেষাদ্রি স্মৃতি-মন্দির

এ অঞ্চলের মেয়ে পুরুষ প্রায় সকলেই স্বদেশী বস্ত্র ব্যবহার করেন। এদেশে মহিসুরের মহারাজদের কৃপায় অনেকগুলি কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়েছে; দিশী সূতায় কাপড় তৈরী হয়। আর একটা লক্ষ্য করলাম যে, এ দেশে পুরুষেরা সবাই শিখা রাখেন এবং মাথায় পাগড়ী বা দিশী টুপী পরেন; যাঁর এ দিকে কোট পেণ্টালুন, কলার নেক্‌টাই পরা, তিনিও মাথা ঠিক রেখেছেন, একেবারে সাহেব বনে যান নাই!

বাজার থেকে বেরিয়েই পুরাতন কেল্লার ভগ্নাবশেষ দেখতে গেলাম। কেল্লাটী বাজারের অতি নিকটে। কেল্লার বিবরণ ও ইতিহাস একটু আগেই ব'লে ফেলেছি।

কেল্লা দেখে বেরিয়ে সহরের বাইরে (যেখানে নূতন সহর পত্তন হচ্চে) একটা শৈলের উপর একটা প্রকাণ্ড মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দিরে ২।৩ জন মাত্র লোক রয়েছে; দেখে বোধ হোলো মন্দিরের আর্থিক অবস্থা ভাল নয়। মন্দিরের মধ্যে অন্ধকার। তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মন্দিরের দেবতা হচ্চেন একটী ষাঁড়। কালো পাথরে তৈরী, ষাঁড়টী আমাদের দেশের ষাঁড়ের দশগুণ—এত বড় তাঁর দেহ। বোধ হয় এইখানেই পাথর কেটে ষাঁড় তৈরী হয়েছে। তাঁরই পূজা হয়। প্রকাণ্ড নাটমন্দির অন্ধকার। মন্দিরের নাম নন্দীবাহন মন্দির। এখানে ছোট বড় মুটে মজুর, দোকানী-পসারী সবাই ইংরাজী জানে ও ঐ ভাষাতেই আমাদের সঙ্গে কথা কয়; তাই আমরা বিবরণ সংগ্রহ করতে পেরেছিলাম। এদের ভাষা দ্রাবিড়ী, আমরা তার এক বর্ণও বুঝি না। এরা মন্দিরের নাম বললে The Bull Temple। এই মন্দিরের ইতিহাস বললেন যে, বৃষবরের পাদ-দেশ থেকে বৃষভাবতি নদীর উৎপত্তি হয়েছে। এই বৃষভাবতি নদী আরকাবতি নদীর একটী ক্ষুদ্র শাখা। রাজা কাম্পে গৌড়া এই মন্দির নির্ম্মাণ করেছিলেন।

ভয়ানক বৃষ্টি এল। মন্দিরেই বসে থাকলাম। বৃষ্টি ছাড়লে রাত্রি

প্রায় সাড়ে সাতটার সময় বাড়ীতে এলাম। আজ বেলা ১২টার সময় হরিদাসবাবুর জামাই আমাদের দক্ষিণাপথ যাত্রার পথযাত্রী শ্রীমান নন্দলাল দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁকে আমরা রবিবারে ওয়াল্‌টেয়ারে রেখে এসেছিলাম। তিনি মান্দ্রাজ দেখে, আজ সকালে এখানে এসেছেন, মডার্ণ হিন্দ হোটেলে (সিটিতে) আছেন। কা'ল সকালের গাড়ীতেই মহিসুর যাবেন। সন্ধ্যার পর তার সঙ্গে দেখা করতে যেতে চেয়েছিলাম, কিন্তু বৃষ্টিতে পেরে উঠি নাই।

মহিসুর গবর্ণমেণ্ট অর্থ মহারাজার গবর্ণমেণ্ট। এখানে ক্যান্টনমেণ্টের সীমানা ছাড়া সব মহারাজার। গবর্ণমেণ্টের সব আফিস এখানে। সেক্রেটেরিয়েট, পুলিশ সব মহারাজার। মহিসুর রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা দেওয়ান, মহারাজার নীচেই তিনি। তিনি রাজ্যের জনসাধারণের নির্ব্বাচিত ও গবর্ণমেণ্টের মনোনীত সদস্যদের সাহায্যে রাজকার্য্য পরিচালন করেন। তিনি এখানেই থাকেন। সব বন্দোবস্ত পাকা আছে, যন্ত্রের মত কাজ চলে। এখন দেওয়ান বাঙ্গালী— এ।বিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আই সি-এস, সি আই-ই। ইনি আমাদের বরাহনগরের মহাত্মা শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। ইনি মাদ্রাজ সিবিলিয়ান, কিন্তু এতদিন এ দেশের রাজাদের দেওয়ানী করে এখন এই রাজ্যের দেওয়ান হয়েছেন। আমাদেরই একজন স্বজাতি এত বড় রাজ্যের কর্ত্তা, এ বড়ই গৌরবের কথা। মহারাজা মহিসুরে থাকেন, কখন দুই এক দিনের জন্য এখানে বেড়াতে আসেন। এখানে মহারাজার প্রাসাদ আছে। দেওয়ানের বাড়ীও রাজপ্রাসাদের মত। মহারাজার নাম—কৃষ্ণ রাজা উদেয়ার জি-সি এস্ আই, জি বি ই। মহিসুরের কথা পরে বলা যাবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল, আমরাও বাসায় ফিরে এলাম। তার পর গল্প-গুজব, মহারাজের কাছে দিনের হিসাব দাখিল ইত্যাদি।
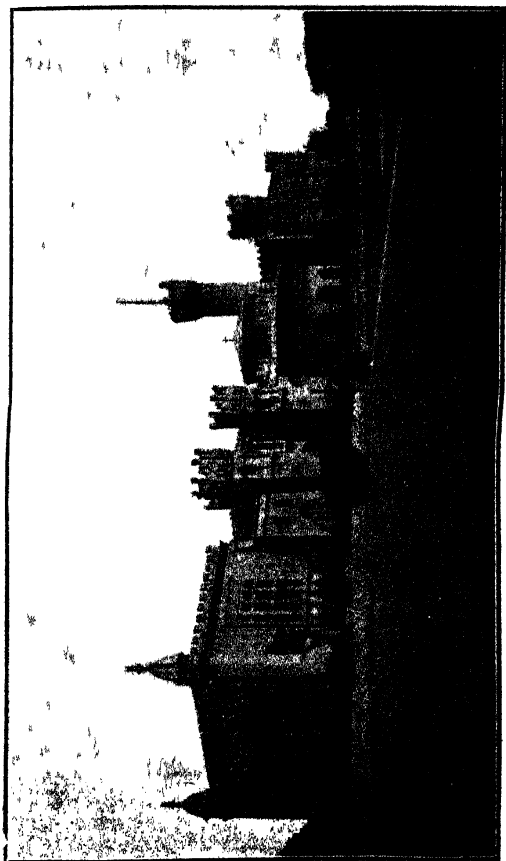
৮ই আশ্বিন, ২৪শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার, সপ্তমী

আজ প্রাতঃকালে মাইল দুই ভ্রমণ,—শুধু ভ্রমণ। অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় একখানি ফিটন নিয়ে গোবীপুরম্ গেলাম। এ স্থানটী সহরের একেবারে বাইরে। সন্ধ্যার একটু আগেই পৌছিলাম। সেখানে পাহাড়ের গা খুঁদে একটা ছোট মন্দির; সবই মাটীর নীচে। পাহাড় কেটে পাতালে ঘর, অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ, একেবারে আঁধার; দিনেই প্রদীপ জ্বালাতে হয়।

নীচে প্রবেশ করে প্রথমে পুষ্প-শোভিত পিতলের শিবপার্ব্বতী মূর্ত্তি দেখ্‌লাম। মূর্ত্তিটি ছোট। তার পিছনেই একটা কক্ষে প্রকাণ্ড শিবমূর্ত্তি। নাম গঙ্গাধরেশ্বর। তাঁর দক্ষিণে একটা কক্ষে প্রকাণ্ড পার্ব্বতীমূর্ত্তি, নানা ভূষণ-ভূষিতা। তার পাশেই একটা সুড়ঙ্গপথ। মন্দিরের পুরোহিত প্রদীপ হাতে নিয়ে সেই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আগে আগে চললেন, আমি আর রামেশ্বর পিছনে। মন্দিরের মধ্যে কোন রকমে দাঁড়ানো যায়, কিন্তু সেই সুড়ঙ্গের মধ্যে মাথা নুইয়ে যেতে হয়। একটু গিয়েই বাঁ হাতের দিকে একটী ছোট গুহা। পুরোহিত বল্‌লেন, এখানে গৌতম ঋষি তপস্যা করতেন। ভাল কথা। তার পর সুড়ঙ্গ ক্রমে অপরিসর হতে লাগল, আমরা ব'সে ব'সে হামা দিয়ে চল্‌তে লাগলাম। তবু সুড়ঙ্গ শেষ হয় না। শেষে পুরোহিত বল্‌লেন যে, এর পরে খানিকটা বুকে হেঁটে যাওয়া যায়; অনেকে গেছেন; তার পর আর যেতে কেউ সাহস করে না। আমরা যে সমভূমি থেকে অনেক নীচে গিয়েছি তা বেশ বুঝতে পারা গেল। সুড়ঙ্গ যে কোথায় শেষ হয়েছে, কেউ বল্‌তে পারে না। প্রবাদ, গৌতম ঋষি এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে প্রত্যহ কাশী যেতেন। কাশী কিন্তু এখান থেকে অনেক দূর। আমরা আর এগুতে পারলাম না; নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌তে

লাগল। তখন হঠাৎ প্রদীপটা নিবে গেল ;—বাতাসে নয়,—বাতাস এত দূর গেলে ত আমরা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচতাম। ব্যস্. সব ঘোর আঁধার। পুরোহিত বল্লেন, আপনারা এখানে চুপ করে ব'সে থাকুন, আমি গিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে আনি। নইলে এ আঁধারে বা'র হওয়া শক্ত। বিশেষ বার হওয়ার দুইটা পথ ছিল। তার একটার মাঝখানে একখানি পাথর পড়ে পথ বন্ধ হয়ে গেছে ; অন্ধকারে সেই পথ ধরলে আর বের হবার উপায় থাক্‌বে না। এই সময় আমার চুরুট খাওয়ার উপকারিতা বেশ বুঝতে পারলাম। পকেটে চুরুট দেশলাই না নিয়ে আমি বোধ হয় স্বর্গে যেতেও এখন রাজি নই। এই অন্ধকারের মধ্যে পকেট থেকে দেশলাই বার করে দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে অতি সন্তর্পণে ফিরে এলাম। সেই সুড়ঙ্গপথের দুইপাশে বল্‌তে গেলে অন্ততঃ তেত্রিশ কোটীর তেত্রিশটী দেবদেবীর মূর্ত্তি। এদের মধ্যে দেবতা প্রায় সকলেই আছেন। একটী দেবতার পরিচয় এই যে, তিনি অগ্নি-দেবতা, তাঁর পা তিনখানি, হাত সাতখানি, মুখ দুইটী। অগ্নি-দেবতার এই মূর্ত্তি শাস্ত্র-সঙ্গত কি না পণ্ডিত লোককে জিজ্ঞাসা করতে হবে। তার পর হাঁফাতে হাঁফাতে মন্দিরের মধ্যে এলাম। পুরোহিত তখন আরতি করলেন, নির্ম্মাল্য দিলেন। রামেশ্বরপ্রসাদের এই মন্দিরের উপর ভারি ভক্তি হোলো ; তিনি একেবারে একটাকা প্রণামী দিলেন। মন্দিরের বাইরে যে উঠান আছে (এ সবই কিন্তু একটা ছোট শৈলের উপরে, সমভূমি থেকে অনেকটা চড়াই উঠে তবে মন্দির, নইলে মাটীর নীচে এত সব ব্যাপার হবে কি করে?) সেই উঠানে পাথরের একটা প্রায় ১২।১৪ হাত দীর্ঘ ত্রিশূল, আর একটা অত-বড়ই দণ্ড, তার মাথায় চালের মত। আরও দুই তিনটা পাথরের স্তম্ভও দেখা গেল।

এই গবীপুরম্ থেকে যখন বে'র হলাম, তখন সন্ধ্যা। সেখান থেকে লালবাগে গমন। লালবাগের ইতিহাস পূর্ব্বেই বলেছি। অন্ধকারে বেশ
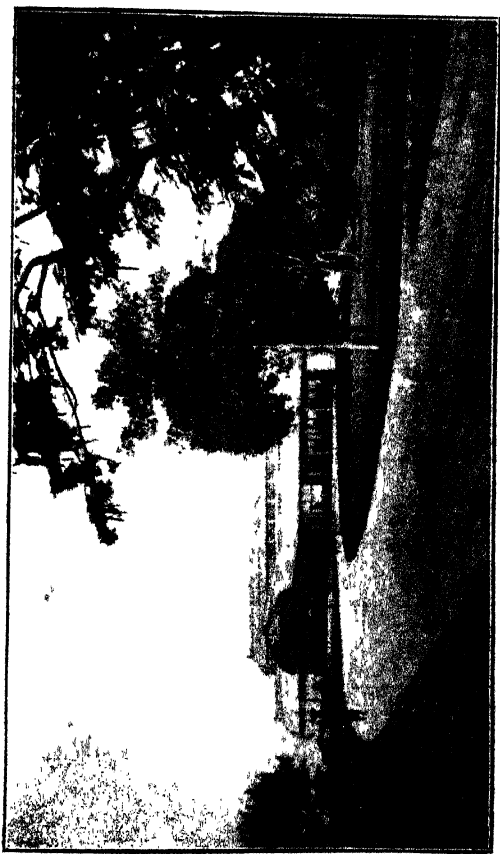
লাল-বাগ উদ্যানের . াস-হাউস

নন্দীবাহন মন্দিরের প্রবেশদ্বার

দেখা গেল না। লালবাগ সহর থেকে প্রায় তিন মাইল; গোরীপুরম্ প্রায় • মাইল। লালবাগ থেকে বেরিয়ে টিপু সুলতানের সুঙ্গে যুদ্ধে যে সকল ইংরেজ হত হন, তাঁদের মেমোরিয়েল দেখলাম। তার পর কাব্বন পার্ক। পূর্ব্বেই বলেছি, সার মার্ক কাব্বন মহিসুর রাজ্যের রেসিডেন্ট ছিলেন, তার আগে কমিশনার ছিলেন। তিনিই এই রাজ্যের শৃঙ্খলা স্থাপন করেন, আইন কানুন করেন, ব্যবস্থা বন্দোবস্ত করেন। তাই মহারাজা এই সুন্দর বাগান ক'রে তার নামে উৎসর্গ করেছেন। এই উদ্যানের কথা পূর্ব্বেই বলেছি।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা মহিসুর সেক্রেটেরিয়েট দেখতে গেলাম। কলিকাতার বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট থেকে কোন অংশে কম নয়, অট্টালিকাও সুন্দর। রাত্রিতে সব বন্ধ, দ্বিতলে দুই একটা ঘরে আলো জ্বলছিল। বাইরে থেকে বাড়ীটা দেখে রাত সাতটার সময় ঘরে ফিরে এলাম।

৯ই আশ্বিন, ২৫শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, মহাষ্টমী

আজ প্রাতঃকালে আর কোথাও গেলাম না। অপরাহ্ণ চারটার সময় পদব্রজে ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল। প্রথমে গেলাম সেক্রেটেরিয়েট দেখতে। পূর্ব্বদিন রাত্রে অন্ধকারে মোটেই দেখতে পাই নি। তারপর গেলাম মিউজিয়ম দেখতে। সেক্রেটেরিয়েটের সম্মুখে কাব্বন সাহেবের প্রস্তর-মূর্ত্তি আজ ভাল করে দেখলাম। মিউজিয়মটি বেশ, ছোট হ'লেও অনেক জিনিস আছে, মাদ্রাজের মিউজিয়মের চাইতে ভাল। এর কথাও আগেই বলেছি। তার পর গেলাম শেষাদ্রি মেমোরিয়েল হল দেখতে। প্রকাণ্ড লাইব্রেরী, অনেক বই আছে, সেখানে বসে পড়বার সুন্দর ব্যবস্থা; বই নিয়ে যেতেও পারা যায়। সেখান থেকে খবর নিলাম যে, মহিসুর ব্যাঙ্কের সম্মুখে একটা দোকানে বাঙ্গালোরের বড় বড় বাড়ী ও প্রধান স্থানগুলির

আলোক-চিত্র পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসা করতে করতে সেই দোকান পেলাম। সেখান থেকে ছয়খানি বাঙ্গালোর সিটির আর ছয়খানি ক্যান্টনমেন্টের আলোক চিত্র কিনলাম। ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখবার খোরাক কিছু সংগ্রহ হোলো। মূল্য দিতে হোলো দেড় টাকা।

তখন অপরাহ্ন ছয়টা। এদিকে সাড়ে ছটায় বাড়ীতে আসতেই হবে। মহাষ্টমী বলে সবাই একটু আমোদ আনন্দের ব্যবস্থা করেছিলেন। সাড়ে ছটায় সেই ব্যাপার আরম্ভ হবে। আমরা তখন দুই মাইলের উপর দূরে। আমার আর চলবার শক্তি ছিল না, প্রায় ৫ মাইল হাঁটা হয়েছিল। কিন্তু কোন রকম গাড়ী সেখানে মেলে না। এত বড় সহর, ফিটন ছাড়া পাল্কো গাড়ী নেই বললেই হয়, সব ঝটকা, ট্যাকসিও বেশী নেই। অনেকক্ষণ রাস্তার ধারে একটা দোকানে বসে রইলাম। দোকানীই একখানি ঝটকা সংগ্রহ করে দিল। যখন কুমারা পার্কে পৌঁছিলাম তখন সাড়ে ছটা হয়ে গিয়েছে, দশ মিনিট লেট। সবাই প্রস্তুত, আমাদের অপেক্ষা। লোকজন ক্রমাগত দৌড়াদৌড়ি করছে। মহারাজের সব একেবারে টাইম-বাঁধা, একটু নড়চড় হবার যো নেই।

যাক্, নির্দ্দিষ্ট সময়ের দশ মিনিট পরে প্রাসাদের বড় হলে সমবেত হওয়া গেল। মহাষ্টমী,—সকলকেই ধুতিচাদর পরে যেতে হবে। আমি ত ধুতি চাদরই ব্যবহার করি, যাঁরা কার্য্যানুরোধে পোষাক পরেন, তাঁরাও সবাই আজ বাঙ্গালী সেজে এলেন। মহারাজাধিরাজ বাহাদুরও আজ বাঙ্গালীর মত ধুতি চাদর না পরে থাকতে পারেন নাই, শুধু মহারাজকুমারদ্বয় পাঞ্জাবী পরিচ্ছদে এসেছিলেন।

বলা বাহুল্য যে, এই আমোদ আনন্দের আয়োজনের কর্ত্তা হচ্চেন শ্রীমান ললিতমোহন। এর আগে দারজিলিং প্রভৃতি স্থানে যে সব
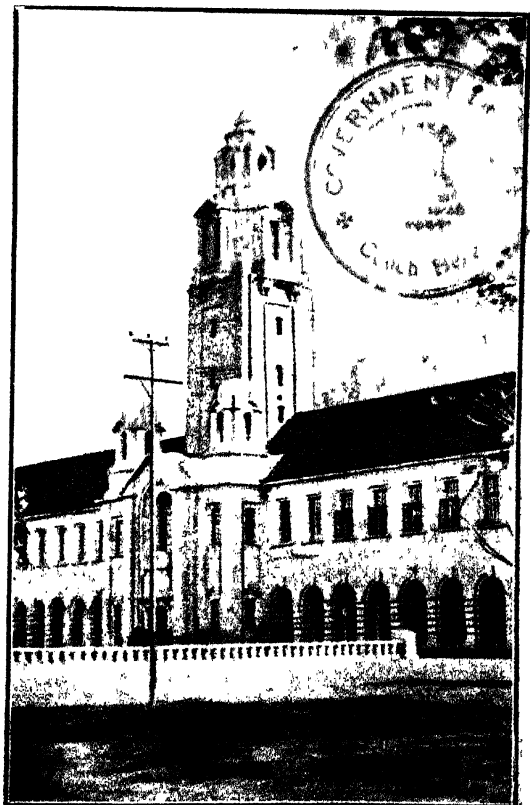
বিজ্ঞান রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট

আমোদ আনন্দের ব্যবস্থা হোতো, তা এই গরিব দাদার স্কন্ধে চাপিয়ে তিনি অব্যাহতি পেতেন। এবার ত তা হবার যো নেই।

প্রথমেই হারমোনিয়ম সহযোগে শ্রীমান ললিত একটী উদ্বোধন সঙ্গীত গাইলেন; তার পর তিনিই একটা দুর্গা স্তোত্র গাইলেন। তার পরেই 'সীতা' নাটকের নির্ব্বাচিত অংশের অভিনয় হোলো। তার পর সবাই মিলে অমর কবি দ্বিজেন্দ্রলালের "আমার জন্মভূমি" গীত হোলো। কোথায় আমার জন্মভূমি, আর কোথায় মহিসুর রাজ্যের বাঙ্গালোর! আজ মহাষ্টমীর দিন আমরা সুদূর-প্রবাসী বাঙ্গালী কয়জন সত্যসত্যই প্রাণের আবেগে গানটী গাইলাম। তার পর মহারাজা পুত্রদ্বয়কে তাঁর দুইপাশে দাঁড় করিয়ে তাঁহারই রচিত "জয় শঙ্কর, শিব ঈশ্বর" স্তোত্রটী অতি ভক্তিভরে গাইলেন। আমি মনে করলাম মধুরেণ সমাপয়েৎ হোলো। কিন্তু তা আর হোলো না, মহারাজ আমাকে গাইতে বললেন। এই বুড়া বয়সে কি আর গান আসে, না আগেকার মত গলার জোর আছে। আমি মার্জ্জনা ভিক্ষা করলাম। সে আবেদন অগ্রাহ্য হোলো। তখন কি করি, কাঙ্গালের সর্ব্বজন-বিদিত "ওরে দিন ত গেল, সন্ধ্যা হোলো, পার কর আমারে"—কোন রকমে গান করলাম। তার পর শ্রীমান রামেশ্বর একটা হিন্দী গাইলেন। সর্ব্বশেষে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কুমারদ্বয়কে নিয়ে তাঁরই রচিত "কে বা গুরু, কে বা শিষ্য, কে বা ছোট, কে বা বড়" গাইলেন। গানটী সত্যই সময়োপযোগী হয়েছিল, আজকার এই মহাষ্টমীর দিনের আনন্দ-সম্মিলনে ছোট বড় কেউ ছিলেন না—মহারাজাধিরাজ থেকে আরম্ভ করে তাঁরই কুড়ি টাকা মাইনের কেরাণী পর্য্যন্ত সবাই এই পবিত্র দিনে মানমর্য্যাদা ভুলে এক হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রি প্রায় নটার সময় মহাষ্টমীর আনন্দ-সম্মিলন ভঙ্গ হোলো।

১০ই আশ্বিন, ২৬ সেপ্টেম্বর, শনিবার, নবমী

আজ নবমী। সারাদিন বিশ্রামের ব্যবস্থা। বিশেষতঃ আজ কুমারা পার্কে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর কনিষ্ঠ মহারাজকুমারের জন্মতিথি উপলক্ষে একটা ভোজের আয়োজন করেছিলেন। আমরা সকলে ত আছিই, এতদ্ব্যতীত বাঙ্গালোরে কার্য্যোপলক্ষে যে কয়জন বাঙ্গালী অবস্থিতি করছিলেন, তাঁদের সকলকেই নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল, আর মাদ্রাজী যে কয়েকটী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের একটু বেশী ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল, তাঁদেরও বাদ দেওয়া হয়নি।

সন্ধ্যার পরই সকলে সমবেত হলেন, রাত্রি নটা পর্য্যন্ত গান বাজনা হোলো, কুমারা পার্কের উদ্যানে বাজী পোড়ানো হোলো। তার পর ভোজ। রাত্রি দশটা বেজে গেল দেখে আমরা তাড়াতাড়ি শয়ন করতে গেলাম, কারণ পরদিন ভোরের গাড়ীতে শ্রীমান রামেশ্বর আর আমি মহিসুরে দশহরার উৎসব দেখতে যাব। বাঙ্গালোরের যে কয়টী বাঙ্গালী বন্ধু নিমন্ত্রণে এসেছিলেন, তাঁরা বলে গেলেন যে, পরদিন বিজয়া উপলক্ষে তাঁরা সকলে সপরিবারে একটা আলোক চিত্র তুলবেন এবং একটা ছোটখাটো উৎসবেরও আয়োজন করবেন, আমাদের তাতে যোগ দেবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করলেন, কিন্তু, আমার ত থাক্‌বার যো নেই। সেই কথা শুনে তাঁরা দুঃখিত হলেন এবং তাঁদের সেই আলোকচিত্র একখানি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, ব'লে গেলেন।

নিউমার্কেট—বাঙ্গালোর
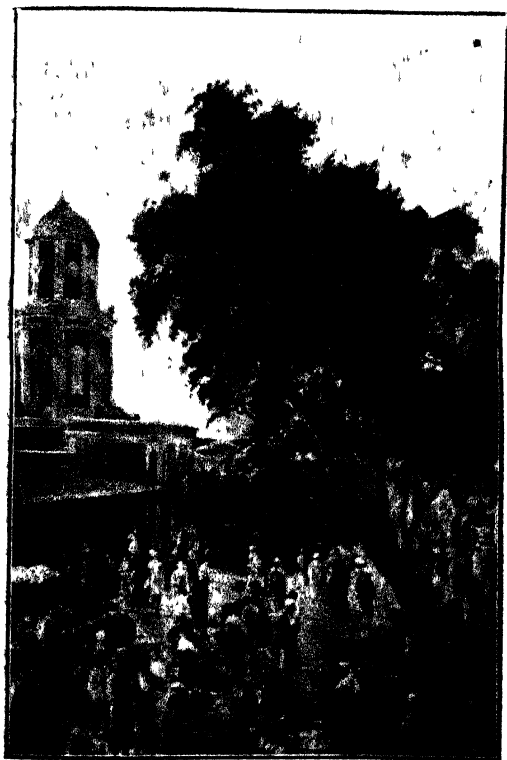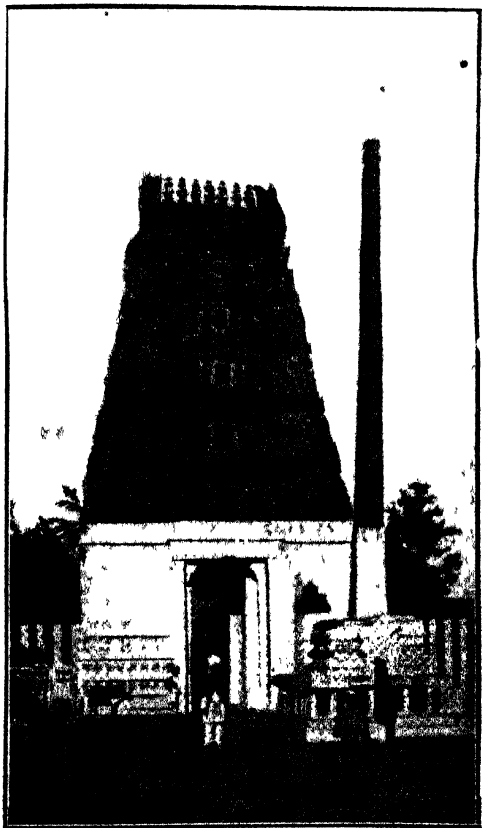
সোমেশ্বর মন্দির

২৭শে সেপ্টেম্বর, ১১ই আশ্বিন, রবিবার, বিজয়াদশমী।—

আজ আমাদের মহিষুর যেতে হবে, কারণ আজ অপরাহ্নকালে মহিষুরে যে দশহরার শোভাযাত্রা বের হয়, তা এই দক্ষিণাঞ্চলে—সুধু দক্ষিণাঞ্চলে কেন, সমগ্র ভারতবর্ষেই একটা দেখ্‌বার মত জিনিষ। কয়েক দিন আগে আমরা যখন মাদ্রাজ থেকে বাঙ্গালোরে আস্‌ছিলাম, তখন গাড়ীতে নানা শ্রেণীর যাত্রীর ভিড় দেখে কারণ অনুসন্ধানে জান্‌তে পেরেছিলাম, এই সব যাত্রী এখন থেকেই দশহরার শোভাযাত্রা দেখ্‌বার জন্য মহিষুরে যাচ্ছে। বিজয়া দশমীর আট দশ দিন আগে থেকেই যাত্রী যেতে আরম্ভ হয়। এর থেকেই বুঝতে পারা যায় যে, দশহরার শোভাযাত্রা দেখবার প্রলোভন এ অঞ্চলের লোকের কত বেশী। আমরা সুদূর বাঙ্গালা দেশ থেকে মহিষুরের এত নিকটে এসে এমন শোভাযাত্রা দেখ্‌ব না, তা কি হয়। সেই জন্য শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর আমাদের আজ প্রাতঃকালে সাতটা কুড়ি মিনিটের গাড়ীতে মহিষুর যাবার ব্যবস্থা করবার কথা তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারী শ্রীমান ললিতকে আদেশ করেছিলেন। এই দশহরা পর্ব্ব উপলক্ষে যে সমস্ত সম্ভ্রান্ত অতিথি মহিষুরে সমাগত হবেন, তাঁদের ব্যবস্থার ভার পেয়েছিলেন বাঙ্গালোরেরই একজন উচ্চ রাজকর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত রাম রাও মহাশয়। তাঁর সঙ্গে শ্রীমান ললিতের বন্ধুত্ব ছিল। ললিত শ্রীযুক্ত রাম রাওকে পত্র লিখেছিলেন যে, তিনি যেন আমাদের এই শোভাযাত্রা দেখ্‌বার একটু সুব্যবস্থা করে দেন; অর্থাৎ আমরা মহিষুর মহারাজের

অনিমন্ত্রিত অতিথি হ'তে চাই নে; আমরা এই চাই যেন তিনি আমাদের মত সম্পূর্ণ অপরিচিত দুইটি মানুষকে শোভাযাত্রা দেখবার সুবিধা করে দেন, নতুবা সেই জনসমুদ্রে আমরা হয় ত দিশেহারা হয়ে যাব। সেই পত্রের উত্তরে শ্রীযুক্ত রাম রাও লিখেছিলেন যে, সাতটা কুড়ি মিনিটের গাড়ী যখন মহিযুর ষ্টেসনে পৌছিবে, তখন তিনি সব কাজ ফেলে রেখে ষ্টেসনে নিজে উপস্থিত থাকবেন এবং আমাদের জন্য যা ব্যবস্থা করতে হয়, সব করবেন।

সুতরাং শ্রীমান রামেশ্বর ও আমি রবিবার প্রাতঃকালে সাড়ে ছয়টার সময় বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। সেই দিনই রাত্রি এগারটার গাড়ীতে আমরা ফিরব; সুতরাং দ্বিতীয় বস্ত্র সঙ্গে নেবারও প্রয়োজন বোধ করলাম না। শ্রীমান রামেশ্বর খাঁটী হিন্দুস্থানী পোযাক পরে, মাথায় প্রকাণ্ড একটা পাগড়ী বেঁধে নিলেন; আর আমি খদ্দরের ধুতি, খদ্দরের পাঞ্জাবী আর একখানি শীতবস্ত্র কাঁধে ফেলে একেবারে পূরা স্বদেশী বাঙ্গালী হ'লাম। পূর্ব্ব রাত্রিতেই মোটরের ব্যবস্থা করা ছিল। ভোরে উঠে চা পান ক'রে মোটরে উঠবার সময় দেখি মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত। তাঁকে যথাযোগ্য অভিবাদন করে, তাঁর নিকট নানা উপদেশ গ্রহণ ক'রে আমরা সিটি ষ্টেসনে গেলাম।

ষ্টেসনে লোকারণ্য—সব মহিযুরের যাত্রী। শুনলাম, অন্য দিনে এই ট্রেণে যত গাড়ী দেওয়া হয়, আজ তার দ্বিগুণ গাড়ী দেওয়া হয়েছে; তবুও রেল কর্ত্তৃপক্ষের মনে হচ্ছিল, এতেও হয় ত সব যাত্রী যেতে পারবে না। একটু পরেই শুনলাম, এ গাড়ী যাবার একঘণ্টা পরে একখানি স্পেশাল ট্রেণের ব্যবস্থা হচ্ছে।

আমাদের ষ্টেসনে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো। দুইখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর দশহরা কনসেসন রিটার্ণ টিকিট কিনলাম; প্রত্যেক খানির
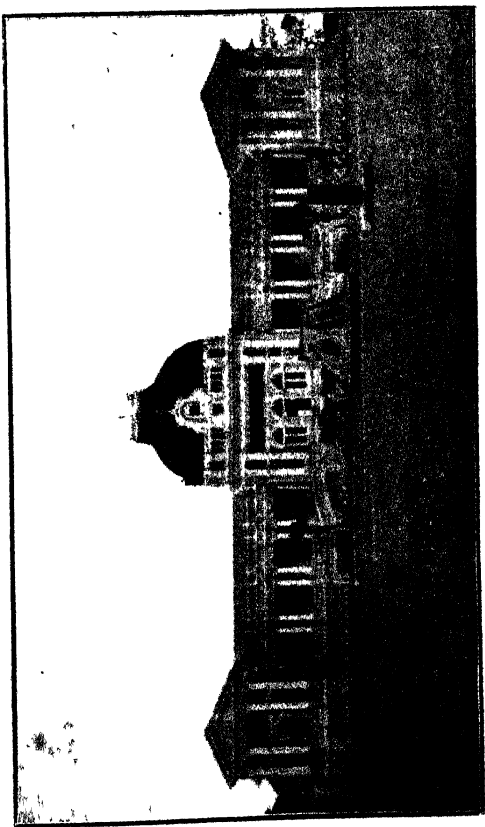
ওরিয়েন্টাল লাইব্রেরী

দাম ৮/০। যথাসময়ে গাড়ী ছাড়ল। রাস্তায় সুধু একটা বড় ষ্টেসন শ্রীরঙ্গপটম্। সেখানে একটা কেল্লা আছে। তার ভগ্নাবশেষ গাড়ী থেকেই দেখ্তে পেলাম। এর পরের ষ্টেসনই মহিসুর।

আমরা ঠিক এগারটার সময় মহিসুর ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। ষ্টেসনে শ্রীযুক্ত রাম রাও স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আজ অনেক কাজ। দেশ-দেশান্তর থেকে যে সব রাজ-অতিথি এসে'ছেন, আসছেন, তাঁদের সব ব্যবস্থা তাঁকে করতে হবে। তা ছাড়া, এই সময়ে ব্যবস্থাপক সভা, প্রতিনিধি সভা প্রভৃতির অধিবেশন হয়। তার জন্য প্রত্যেক জেলার নির্ব্বাচিত ও মনোনীত সদস্যগণ এই সময় সমাগত হন। তাঁদেরও অভ্যর্থনা ও অবস্থানের ব্যবস্থা তাঁকে করতে হয়েছে। সুতরাং শ্রীযুক্ত রাম রাও মহাশয়ের তিলার্দ্ধ অবকাশ ছিল না। তবুও তিনি ষ্টেসনে এসেছিলেন। আমরা কাহারও অতিথি নই, তবুও শ্রীযুক্ত রাও মহাশয় আমাদের জন্য ব্যবস্থা করেছিলেন। ষ্টেসনে আমাদের জন্য একখানি ফিটন ছিল। শ্রীযুক্ত রাও বল্লেন, এই গাড়ী তখন থেকে রাত ১১টায় আমাদের ষ্টেসনে পৌঁছে দেওয়া পর্য্যন্ত হাজির থাকবে। নূতন অতিথিশালায় (The Modern Hindu Guests' House) আমাদের থাক্‌বার স্থান তিনি ঠিক করে রখেছিলেন। সেই অতিথিশালার সুপারিনটেণ্ডেণ্টও ষ্টেসনে আমাদের জন্য এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত রাম রাও আমাদের তাঁর জিম্মা করে দিলেন।

Guest House ষ্টেসন থেকে মিনিট দশেকের পথ। সেখানে আমাদের যে ঘর দেওয়া হোলো, তা অতি সুন্দর। প্রকাণ্ড দ্বিতল বাড়ী, ত প্রাঙ্গণ। প্রত্যেক অতিথির জন্য একটী শোবার ঘর, তার পাশেই একটী খাবার ঘর, তার পাশেই স্নানের ঘর পাইখানা প্রভৃতি। ঘরে জনের মত খাট, বিছানা, মশারী, টেবল চেয়ার, আয়না, বৈদ্যুতিক

আলো সবই আছে। অর্থাৎ, রাজ-অতিথি না হয়েও আমরা রাজার হালে থাকবার সুবিধা পেলাম।

আমি তখন তাড়াতাড়ি স্নান করে নিলাম। সঙ্গে বিছানা বা দ্বিতীয় বস্ত্র ছিল না; সুধু একখানি ছোট তোয়ালে পকেটে নিয়েছিলাম। স্নানের পরই আহার। ভাত, লুচি, তরকারী, দৈ, অম্বল, ভাজা সবই ছিল, কিন্তু সবই সে দেশী রান্নার গুণে আমাদের পক্ষে সুখাদ্য হোলো না। আমরা নিরামিষ খেলাম। এদেশের রান্না বড়ই খারাপ। এরা সরিষার তেল ব্যবহার করে না, গুঁজির তেল দিয়ে রান্না করে, তাতে আমাদের গন্ধ লাগে। ভাত, লুচি ক'খানি আর দৈ কলা দিয়েই খাওয়া শেষ করলাম। একজন পথি-প্রদর্শক ঠিক করা গেল, সে হোটেলেরই লোক। আমরা বিশ্রাম করতে লাগলাম। পথি-প্রদর্শক মহাশয় আহারাদি শেষ করে আসতে গেলেন।

ঠিক একটার সময় সহর দেখতে বের হলাম। দশহরার শোভাযাত্রা বেরুবে ৪টার সময়। তার পূর্ব্বে যতটা হয় সহর দেখে নিতে হবে। সরকারী আফিস, কলেজ, হাসপাতাল প্রভৃতি দেখে নিয়ে জগমোহন প্রাসাদ দেখ্তে গেলাম। প্রকাণ্ড বাড়ী। এখানে মহারাজ এখন থাকেন না, এর চাইতেও প্রকাণ্ড অন্য প্রাসাদে থাকেন। জগমোহন প্রাসাদে মহারাজার খাস থিয়েটারের ষ্টেজ দেখলাম। প্রাসাদেরই প্রকাণ্ড একটা হলে রাজ্যের ব্যবস্থাপক সভা (Legislative Council) বসে। আর একটা হলে রাজ্যের প্রতিনিধি সভা (Representative Assembly) বসে। এই সময় সমস্ত সভার ভিন্ন ভিন্ন দিনে অধিবেশন হবে। প্রেসিডেন্ট হবেন দেওয়ান বাহাদুর সার রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়।

জগমোহন প্রাসাদ খুব সাজানো। প্রকাণ্ড বৈঠকখানা (Drawing-room) তখন বন্ধ ছিল। তিনটার সময় খুল্‌বে, সাড়ে পাঁচটায় বন্ধ হবে।

বর্ত্তমান দেওয়ান রাজমন্ত্রীধুরীণ সার এল্‌বিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

লে দলে লোক বসে আছে ড্রয়িং রুম দেখবার জন্য। শুনলাম এই বঠকখানা মহিষুরের একটা প্রধান দ্রষ্টব্য। তখন পৌনে দুইটা। যামরা ঠিক করলাম, ৪টার সময় শোভাযাত্রা দেখে এসে জগমোহন প্রাসাদের বৈঠকখানা দেখব। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর হোলো না. শাভাযাত্রা দেখতে দেখতেই সন্ধ্যা লেগে গেল।

সেখান থেকে বেরিয়ে বড় রাজপ্রাসাদ বাইরে থেকে দেখে নিলাম, ভতরে যাওয়া অসম্ভব। হাজার হাজার লোক সকাল থেকে শোভাযাত্রা দখবার জন্য প্রাসাদের সম্মুখে অপেক্ষা করছে। এই প্রাসাদ থেকেই শাভাযাত্রা বের হয়ে প্রায় দুই মাইল রাস্তা গিয়ে অন্য একটা প্রাসাদে বশ্রাম করবে।

চারটা বাজবার তখন দেরী দেখে, আমরা চিড়িয়াখানা দেখতে গেলাম। শনী প্রত্যেকের ছয় পয়সা। বিশেষ যে কিছু দেখবার আছে তা মনে হোলো না; তবে দুইটা সাদা ভালুক এই প্রথম দেখলাম।

অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে এসে দেখি, বেলা পৌনে চারটা। খন যে পথে শোভাযাত্রা যাবে, সেই পথের এক স্থানে গেলাম। পথি-প্রদর্শক নিকটস্থ পুলিস ষ্টেসনে গিয়ে আমাদের কথা বলতে সেখানকার দারোগা মশাই আমাদের তাঁর আফিসের মধ্যে নিয়ে বসালেন।

শোভাযাত্রা বেরুতে দেরী হয়ে গেল। প্রাসাদ থেকে পৌনে পাঁচটায় যাত্রা আরম্ভ হোলো। দারোগা মহাশয় থানার সম্মুখে রাস্তার বিপুল জনতা সরিয়ে দিয়ে আমাদের জন্য রাস্তার পাশে দুখানা চেয়ার এনে বসবার বন্দোবস্ত করে দিলেন এবং লোকজন সরিয়ে দেবার জন্য দু-পাশে দু জন লাল পাগড়ী দাঁড় করিয়ে দিলেন।

এইবার শোভাযাত্রা এসে পড়ল। প্রথমে অশ্বারোহী, পদাতিক, প্রভৃতি সামরিক কায়দায় যেতে আরম্ভ করল। এদের যাত্রা আর ফুরায়

না—প্রায় হাজার দুই তিন সৈন্যই গেল! তার পর অসংখ্য সুসজ্জিত ঘোড়া ও গরুর গাড়ী, উটের গাড়ী, হাতীর গাড়ী যেতে লাগল; রাজভাণ্ডার খালি করে এই সব জন্তুদের মণিমুক্তা, স্বর্ণাস্তরণ দিয়ে বিভূষিত করা হয়েছে। তার পর দলে দলে বাজনদার, নানান যন্ত্র বাজিয়ে গেল; আসা সোটাধারীও বোধ হয় দুই তিন হাজার গেল। রাজ্যের যত সব বড় বড় কর্ম্মচারী নগ্নপদে শোভাযাত্রার সঙ্গে গেলেন। এ দৃশ্য দেখবার মত। তার পর প্রকাণ্ড একটা হাতীর উপর সোণার হাওদা, তাতে মহারাজ উপবিষ্ট। আমরা যেখানে ছিলাম, সেই পুলিস ষ্টেসনের সম্মুখে প্রকাণ্ড একটা দ্বার-মণ্ডপ তৈরী করা হয়েছিল। সেই সুন্দর গেটে পত্র-পুষ্প-শোভিত মহারাজের আলেখ্যও ছিল। পুলিশের লোকেরা পুষ্পমাল্য উপহার দেবার জন্য প্রস্তুত ছিল। তাই মহারাজের হাতী সেখানে একটু দাঁড়ালো। উপস্থিত সকলেই অভিবাদন করলেন, আমরাও করলাম। মহারাজ প্রত্যভিবাদন করলেন। তার পর শোভাযাত্রা শেষ হয়ে গেল। বিপুল শোভাযাত্রা—আমাদের সম্মুখ দিয়ে যেতে এক ঘণ্টার উপর লাগল। এই শোভাযাত্রায় দেখলাম, বিলাতী সামরিক কায়দাও আছে, আবার খাঁটি দিশী কায়দাও আছে। এমন বিপুল শোভাযাত্রা আর কখন কোথাও দেখি নাই।

আমরা তখন আবার গাড়ীতে চড়ে অন্য পথে গিয়ে গিয়ে আর একবার শোভাযাত্রা দেখলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। শুনলুম রাজপ্রাসাদ আর তার নিকটস্থ সমস্ত অট্টালিকা তখনই বৈদ্যুতিক আলোকে সজ্জিত হ'য়েছে। সচরাচর যা আলো জ্বলে, তা ছাড়া সেদিন ৬০ হাজার অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক আলোকে রাজ-প্রাসাদ আলোকিত হয়েছিল। আমরা তাড়াতাড়ি সেই আলোক-সজ্জা দেখতে গেলাম। কোথায় সন্ধ্যা—কোথায় অন্ধকার;—রাজপ্রাসাদ ও অন্যান্য প্রাসাদ

জগমোহন প্রাসাদ
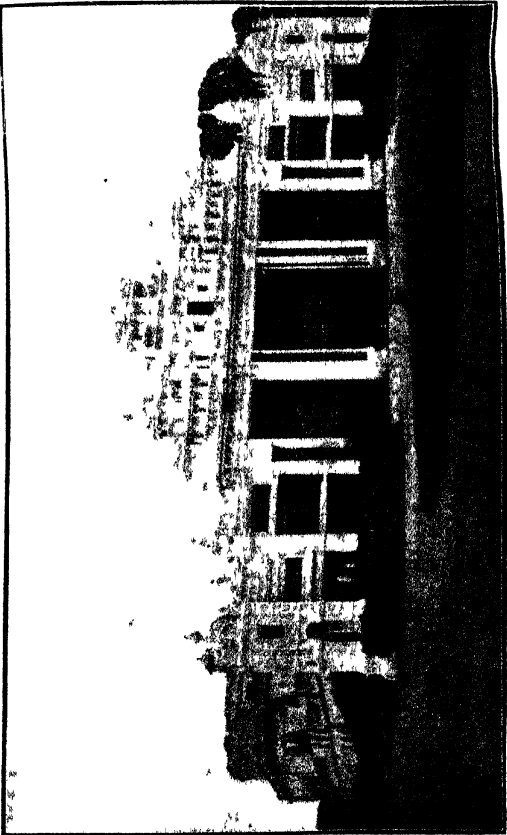
পরলোকগত মহারাজা শ্রীচামরাজেন্দ্র উদেয়ার বাহাদুর

একেবারে আলোর মালায় বিভূষিত। এমন আলোর শোভা পূর্ব্বে কখন দেখিনি।

প্রাসাদের এই আলোক-সজ্জার মধ্যে সম্মুখস্থ কার্জ্জন পার্ক দেখলাম। বেশ বড় পার্ক। একটু দূরেই বাজার ; সেটীও দেখবার মত। মহারাজার পার্কও অতি সুন্দর ; বিশেষতঃ সেই সন্ধ্যায় বৈদ্যুতিক আলোতে শোভা আরও বেড়েছিল। প্রাসাদের অনতিদূরে একটা স্থানে ছয়টী বড় বড় রাস্তা এসে মিলেছে। সেখানটাও চমৎকার। তার নাম হার্ডিঞ্জ চক্র।

সাতটা বেজে গেছে দেখে আমরা বাসায় এলাম। হাত মুখ ধুয়ে সেই ও বেলার মত আহার। তাড়াতাড়ি আহার সেরে ফেরত-শোভাযাত্রা দেখতে বাহির হলাম। ঐ পথেই ষ্টেসনে যেতে হবে, তাই চাকর-বাকরদের কিছু বক্‌শিস্ দিতে গেলাম। তারা কেউ কিছু নিতে চায় না—গাইডও কিছু নেবে না ; কারণ রাজভৃত্যদের কারুর একটি পয়সা নেওয়ারও হুকুম নেই। কর্তৃপক্ষ জান্‌তে পার্‌লে তাদের সর্ব্বনাশ। এ অবস্থায় সকলে যা করে, আমরাও ভৃত্যদের আশ্বাস দিয়ে তাই করলাম। তার পর ফেরত-শোভাযাত্রা দেখতে বার হলাম।

ফেরত যাত্রা সাড়ে ন'টায় আস্‌বে। আমাদের ফিরবার ট্রেন ১১টা রাত্রিতে। শুন্‌লাম ফেরত-যাত্রার সজ্জা আরও মনোহর হবে। এখানে ত দুর্গোৎসব হয় না ; সাতদিন পর্য্যন্ত রাজ্যের প্রধান হাতী, ঘোড়া, গরু, পাল্‌কী, হাওদা, সিংহাসন প্রভৃতির শাস্ত্রানুমোদিত অনুষ্ঠান ক'রে স্নান ও পূজা করা হয়। এই সাতদিন পর্য্যন্ত যে ভাগ্যবান্ হাতী, ঘোড়া, গরু, পাল্কী এবং হাওদার স্নান ও পূজা হ'য়েছিল, এই ফেরত-শোভাযাত্রায় তাঁদেরও দর্শন লাভ হবে।

রাত সাড়ে ন'টার সময় আমরা পূর্ব্বের মত সেই পুলিস ষ্টেসনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে শোভাযাত্রা দেখলাম। অর্দ্ধেক শোভাযাত্রার সঙ্গে হাজার হাজার
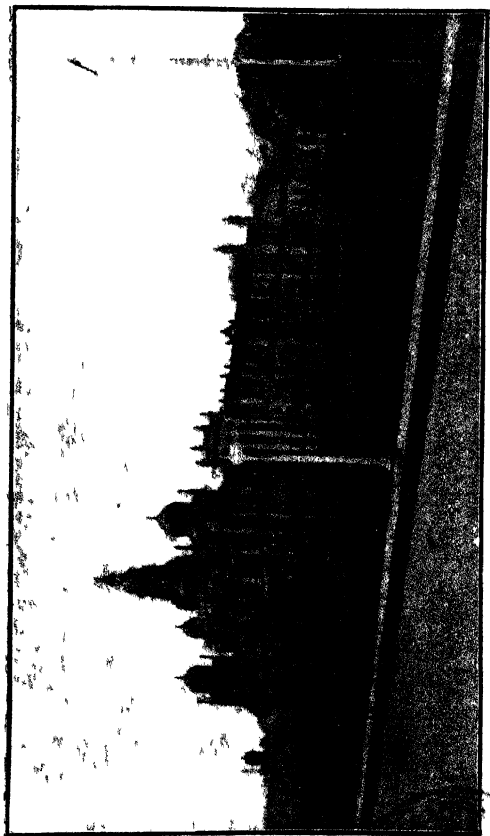
উত্তব দিক হইতে বাজপ্রাসাদেব দৃশ্য

হবে, এবং আমার মনে হয় দক্ষিণাপথের বিবরণও অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তাই অতি সংক্ষেপে মহিযুব-রাজবংশ সম্বন্ধে দুই একটা কথা এখানে নিবেদন করতে চাই।

প্রথমেই মহিষুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে শাস্ত্রীয় কথা প্রচলিত আছে, তাই বল্‌ছি। কাদের কৃপায় এ স্থানের নাম এখন 'মাইশোরে' (Mysore) পরিণত হয়েছে, তা আমি জানিনে। তবে, বাল্যকাল থেকে ভূগোলসূত্রের কৃপায় এ স্থানের বানান মুখস্থ করেছিলাম 'মহীশূর'; তারপর জিয়োগ্রাফি পড়ে বানান শিখেছিলাম মাইশোর। কিন্তু, এখন আমি ঐ দুই বানানই ত্যাগ ক'রে নাম দিয়েছি 'মহিযুব'। দক্ষিণাপথে যাবার অনেক পূর্ব্বে আমার সোদরোপম বন্ধু রায় শ্রীযুক্ত রমণীমোহন ঘোষ বাহাদুরের সঙ্গে একদিন কথাপ্রসঙ্গে এই নামটী সম্বন্ধে আলোচনা হয়। তিনি তখন মান্দ্রাজ হইতে সদ্য-প্রত্যাগত। সেখানে তিনি পোষ্ট-মাষ্টার-জেনারেল ছিলেন; এবং সেই সুযোগে দক্ষিণাপথের অনেক স্থান ভ্রমণও করেছিলেন এবং অনেক তথ্যও সংগ্রহ করেছিলেন। তিনিই বলেছিলেন যে, ঐ রাজ্যের নামের বানান মহিযুব হওয়াই উচিত, কারণ, যতদূর অনুসন্ধানে জানা যায়, তাতে ঐ স্থানেই চণ্ডীদেবী মহিষাসুর বধ করেছিলেন; সুতরাং সেই উপলক্ষেই এই নামকরণ হয়েছে। তারপর আমি দক্ষিণাপথে গিয়ে অনুসন্ধান ক'রে ও পুঁথিপত্র দেখে ঐ কথাই জান্‌তে পারি। রাজ্যটীর আদিম নাম ছিল 'মহিষ-উরু; ও দেশের ভাষায় 'উরু' শব্দর অর্থ 'নগর'। মহিষাসুর বধের পৌরাণিক বৃত্তান্ত অনুসারে এই স্থানেই তিনি চণ্ডীদেবী কর্ত্তৃক নিহত হন; সেই থেকে এ স্থানের নাম 'মহিষ-উরু' হয়েছিল। তার পর, ক্রমে পরিবর্ত্তিত হ'তে হ'তে বর্ত্তমান নামে এসে ঠেকেছে। আমরা সেই জন্যই এ রাজ্যের নামের বানান 'মহিষুর' বহাল রাখ্‌লাম। তবে, এখানেই যে মহিষাসুর বধ

হয়েছিল, তার পাথুরে প্রমাণ আমি ত দিতে পারব-ই না, আর কেউ পারবেন কি না সে বিষয়েও সন্দেহ আছে—সে যে পৌরাণিক কালের কথা !

পৌরাণিক যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসের যুগে আসা যাক। মহিসুর রাজ্য সে-দিন স্থাপিত হয় নাই ; তার প্রথম প্রমাণ এই যে, এই বিপুল জনপদের প্রান্তে এখনও অশোকের স্তম্ভ রয়েছে। তার পর, ইতিহাস পড়লে জানতে পারা যায় যে, এই মহিসুর-রাজ্যে অনেক প্রসিদ্ধ রাজ-বংশ রাজত্ব করে গিয়েছেন,—যথা, শতবাহন, কদম্ব, গঙ্গাবংশ, চালুক্য বংশ, রাষ্ট্রকূট, চোল, হৈশাল ইত্যাদি। তাঁদের পর বিজয়নগর রাজ-বংশ এখানে রাজত্ব করেন ; তাঁদের পরই বর্ত্তমান রাজ-বংশের অধিকার এখানে স্থাপিত হয়েছে। সুতরাং খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতেও যে মহিসুর রাজ্য ছিল—সুধু বিদ্যমান নয়, মহাপ্রতাপশালী ছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তার প্রমাণ আছে। হৈশালা রাজ-বংশ মহিসুরে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজত্ব করেছিলেন। সে কালের ইতিহাস আরও বেশী দিতে গেলে হয় ত অনেকের ভাল লাগবে না ; তাই ও-কথার এখানেই 'ইতি' করে বর্ত্তমান রাজ-বংশের একটু বিবরণ দিই।

এখন যে বংশ মহিসুরে রাজত্ব করছেন, এঁরা উদেয়ার বংশ। এঁদের কুলজি আছে। তার থেকে জান্‌তে পারা যায় যে, এঁরা চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় যাদব শাখা হতে উদ্ভূত হয়েছেন। তা হ'লে এঁরা যে শ্রীকৃষ্ণের বংশজাত, সে কথা বলা যেতে পারে। যখন বিজয়নগর রাজ্যের পত্তন হয়, সেই সময় এই যাদবশাখার দুই ব্যক্তি দেশত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে আসেন এবং মহিসুরের মাইল কয়েক দূরে হাদিনাদ (এখন যার নাম হাদিনারু) গ্রামে বাস করতে আরম্ভ করেন। এই স্থানে ক্রমে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হ'তে থাকে। এঁরা কবে এসেছিলেন, তা আমি বল্‌তে পারব না,

রাজপ্রাসাদের আলোক-সজ্জা
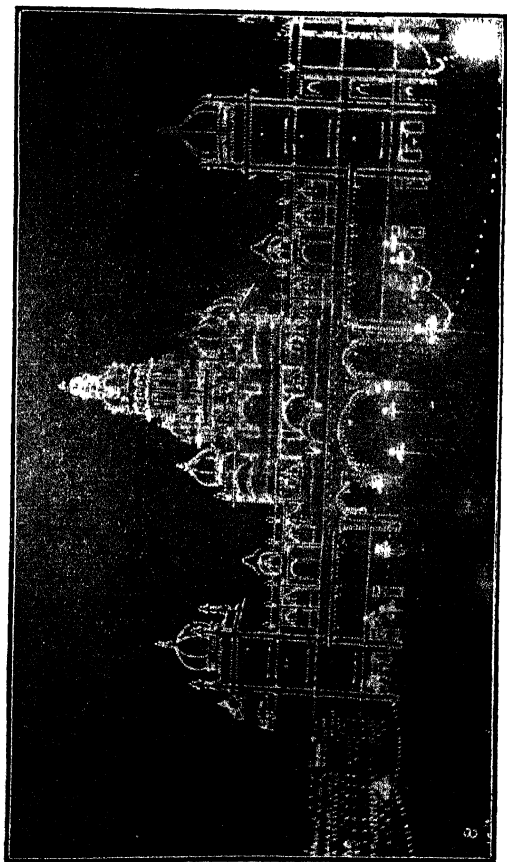
তবে এটুকু বলতে পারি যে, সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই বংশের উত্তরাধিকারীরা বেশ গুছিয়ে নিয়েছিলেন—বলতে গেলে রাজত্বই করতেন। এঁদের গোড়া থেকে নামের তালিকা আছে, কিন্তু, আমি সে সকল
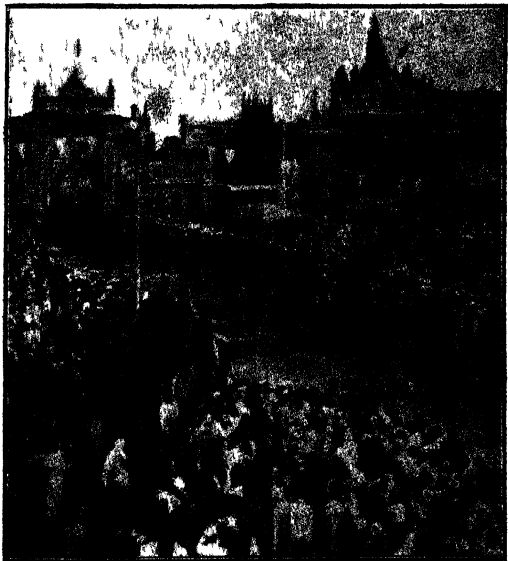
শোভাযাত্রার হস্তীবাহিত যান

নামের উল্লেখ না করে, একেবারে রাজা উদেয়ারেরই নাম করছি। মহিসুর তখন একটা বড় রাজ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রাজা উদেয়ার ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাঁর হাতেই রাজ্যের সমৃদ্ধি আরম্ভ হয়।

ইনি এমন বীর ছিলেন যে, ইনি শ্রীরঙ্গপটম্ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তৃত করেন। তার পরে, নাম করবার মত রাজা হয়েছিলেন চিক দেবরাজ উদেয়ার। ইনি ১৬৭২ অব্দ থেকে ১৭০৪ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এঁরই আমলে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালোর মহিষুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মহিষুর রাজ্যের সীমা খুব বেড়ে যায়। এঁর পরেই যাঁরা রাজা হন, তাঁরা তেমন কাজের লোক ছিলেন না, শৌর্য্যবীর্য্যও তাঁদের তেমন ছিল না; সুতরাং কাছে কিনারে যাঁদের শক্তি প্রবল ছিল, তারা অধিকার বিস্তার করতে লাগল। শেষে এমন হলো যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীর হাইদার আলি মহিষুর রাজ্য কেড়ে নিয়ে নিজে রাজা হ'য়ে বসেন। তাঁর সময়ে এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উপযুক্ত পুত্র টিপু সুলতানের রাজত্ব সময়ে মহিষুর রাজ্যের অনেক উন্নতি হয়। তার পর ইংরাজ সরকারের সঙ্গে টিপুর যে যুদ্ধ হয়, তাতে তিনি হেরে যান এবং ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হ'লে ইংরাজ-সরকার পুনরায় সেই পুরাতন উদেয়ার-বংশীয় মহারাজা শ্রীকৃষ্ণরাজা উদেয়ার বাহাদুরকে রাজ্য প্রদান করেন। ইনিই উক্ত নামধারী তৃতীয় মহারাজ। ইঁহারই পুত্র মহারাজ শ্রী চাম-রাজেন্দ্র উদেয়ার বাহাদুর জি-সি-এস-আই। ইনিই কলিকাতায় বেড়াতে এসে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে অকস্মাৎ ডিপ্‌থিরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রাণত্যাগ করেন। কালীঘাটের কেওড়াতলার মহাশ্মশানক্ষেত্রে তাঁর প্রকাণ্ড সমাধি-মন্দির রয়েছে।

মহারাজ চামরাজেন্দ্র উদেয়ার যখন পরলোকগমন করেন, তখন বর্ত্তমান মহারাজ শ্রীকৃষ্ণরাজা উদেয়ার বাহাদুর জি-সি-এস্ আই, জি-সি-বি-ই মহোদয় নাবালক ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট তখন তাঁহার মাতা মহারাণী বাণীবিলাস সান্নিধানা মহোদয়ার হস্তে রাজ্যভার ও নাবালকের শিক্ষার ভার প্রদান করেন। মহারাণী সেই দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য যে কি ভাবে সম্পন্ন

করেছিলেন, তাহা বর্ত্তমান মহারাজা ব'হাতুরের অতুলনীয় কার্য্য-কলাপেই প্রকাশিত। আমার মনে হয়, ভারতবর্ষে এমন সুশাসিত ও সমৃদ্ধ রাজ্য অতি কমই আছে। মহিসুরের এই সমৃদ্ধির কথা বল্‌তে গিয়ে

দশহরার শোভাযাত্রা
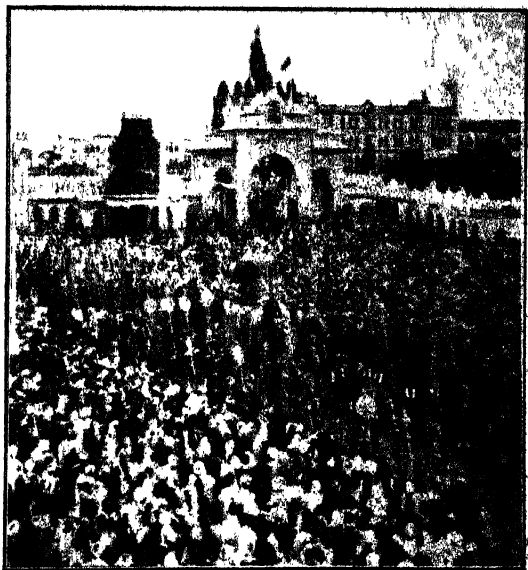
সার শেষাদ্রি আয়ার মহোদয়ের নাম আপনা হইতেই স্মৃতিপথে উদিত হয়। তিনি এই রাজ্যের উন্নতির জন্য কি চেষ্টাই করেছিলেন। তাঁর কথা পূর্ব্বেই বলেছি। বাঙ্গালোরে এবং মহিসুরে সাধারণ

লোকের সঙ্গে কথাবার্ত্তা ব'লে দেখেছি যে, তারা মহারাজকে দেবতা জ্ঞানে শ্রদ্ধার অঞ্জলি দিয়ে থাকে। প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সমৃদ্ধির জন্য মহারাজ কত যে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান করেছেন, তার সংখ্যা করা যায় না। মহিষুরে রাজ্যের রাজস্ব থেকে যা আয় হয়, নানা কল-কারখানা থেকে তার চাইতে

ভূতপূর্ব্ব দেওয়ান সার শেষাদ্রি আয়ার বাহাদুর

কম আয় হয় না; আর দেশের লক্ষ লক্ষ লোক এই সব প্রতিষ্ঠানে কাজ ক'রে জীবিকা অর্জ্জন করছে। কাপড়ের কল যে কত আছে, তা বলা যায় না। বন-বিভাগ থেকে পূর্ব্বে কাঠ বিক্রয় করেই যা লাভ হোতো; মহারাজা বাহাদুর যে চন্দন-কাঠের কারখানা প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তার

থেকে কাঠ ত বিক্রয় হয়-ই তা ছাড়া চন্দনের তৈল, চন্দনকাঠের নানা আসবাব, সাবান প্রভৃতির খুব কাটতি। সাবানের কল, দিয়াশলাইয়ের কল, আরও কত কি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার পর কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য জলসেচনের যে ব্যবস্থা রাজ্যমধ্যে করেছেন, তা দেখলে মহারাজকে প্রশংসা না করে থাকা যায় না। কোলারের স্বর্ণখনি ও কাবেরীর জল-প্রপাত থেকে বৈদ্যুতিক শক্তির উৎপাদন এই মহারাজার

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ও শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার
সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল রাজতন্ত্রপ্রবীণ

আমলেই হয়েছে, এবং এই দুইটি কারখানা যদিও বিভিন্ন কোম্পানী কর্ত্তৃক পরিচালিত হচ্চে, তা হো'লেও এদের থেকে মহারাজের রাজকোষও স্ফীত হচ্চে; তাঁর হাজার হাজার প্রজার জীবিকা-সংস্থান হচ্চে। বিদ্যাচর্চ্চায় মহারাজের অতুল উৎসাহ, মহিসুর বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙ্গালোর কলেজ ও রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, মহিসুর মহিলা কলেজ তার জাজ্বল্যমান প্রমাণ। এই

মহিষুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্সেলর ও রাজ্যের শিক্ষাসচিব হচ্চেন আমাদের বাঙ্গালীর উজ্জ্বল রত্ন শ্রীযুক্ত সার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। মহারাজ তাঁকে 'রাজতন্ত্র-প্রবীণ' উপাধি দান করে সম্মানিত করেছেন। পূর্ব্বেই বলেছি এ রাজ্যের বর্ত্তমান দেওয়ান হচ্চেন বাঙ্গালী। তাঁর নাম সার এলবিয়ন রাজকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কেটি, এম-এ, সি-এস্-আই, সি-আই-ই। মহারাজ তাঁকে 'রাজমন্ত্রধুরীণ' উপাধি দিয়েছেন। আমাদের দেশের রায় সাহেব, রায় বাহাদুর প্রভৃতি উপাধির চাইতে এ সব উপাধি কেমন সুন্দর, আর কেমন স্বদেশী! দুঃখের বিষয় মহারাজ নিঃসন্তান। তিনি সর্ব্বদা পূজা-অর্চ্চনাতেই নিবিষ্ট আছেন। তাঁর ছোট ভাই যুবরাজ শ্রীশ্রীকান্তিরাভ নরসিংহরাজ উদেয়ার বাহাদুর জি·সি·আই·ই মহোদয় মহিষুর রাজ্যের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী।

এইস্থানেই মহিষুরের কথা শেষ করলাম।

২৮শে সেপ্টেম্বর, ১২ই আশ্বিন - সোমবার।—

আজ রাত্রি পৌনে ন'টায় আমাদের তীর্থ-ভ্রমণে যেতে হবে; তাই বিগত কল্য কোন রকমে মহিষুরের প্রধান পর্ব্ব দশহরার উৎসব দেখা শেষ করে, রাত্রির গাড়ীতে যাত্রা করে আজ প্রাতঃকালে বাঙ্গালোরে এসেছি। কুমারা পার্কে আমাদের প্রবাস-ভবনে এসে দেখি সেই সকাল থেকেই বাধাছাঁদার পর্ব্ব আরম্ভ হয়েছে। কথাটা বোধ হয় ঠিক বলা হো'ো না; দুই তিন দিন পূর্ব্ব থেকেই আমাদেব তীর্থ-ভ্রমণের আয়োজন চল্‌ছিল। কিন্তু সে যে একটা বিরাট ব্যাপার, তা আমি মনে করতেও পারি নাই। পাঁচদিনেব জন্য যেতে হবে; তার আয়োজনই বা কি, আর এত ব্যবস্থাই বা কেন? কিন্তু, সে ভ্রম ভেঙ্গে গেল, যথন সন্ধ্যাব পব বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসনে উপস্থিত হয়ে দেখ্‌লাম যে, আমাদের সঙ্গী হবার জন্য প্রায় শতাধিক ছোট বড় লগেজ ষ্টেসন প্ল্যাটফরমে জমা হয়ে রয়েছে।

আমবা প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে আমাদের আড্ডায় ব'সে মহিষুরের কথা বল্‌ছি, এমন সময় মহারাজ এসে উপস্থিত এবং আমাদের কি কি সঙ্গে যাবে, সে সব তথনই গুছিয়ে ফেলতে বল্‌লেন। শ্রীমান রামেশ্বর বল্‌ল "এথনও ত বহুত দেরী আছে। আমাদের সামান্য কিছু যাবে; সে আমরাই সঙ্গে নিয়ে যাব।"

মহারাজ হেসে বল্‌লেন "তা হ'লেই হয়েছে আর কি। এক আধ

বেলা নয়, পাঁচ পাঁচ দিন বাইরে থাকতে হবে। ও সব ছেলেমানুষী নয়। দেখি, সব বাক্স খোল। কি কি যাবে না যাবে আমি ঠিক করে নিয়ে যাচ্ছি। জিনিষপত্র চাকরদের জিম্মা করে দিতে হবে যে।" তখন আর কি করা যায়, সুশীল ও সুবোধ বালকের মত ব্যাগ ট্রাঙ্ক প্রভৃতি খুলতে হোলো। তিনি নিজে পসন্দ করে কাপড় চোপড় ও বিছানা চাকরদের দিয়ে কুমারা পার্কে নিয়ে গেলেন; অবশিষ্ট যা রইল, তা গুছিয়ে তুললাম।

আমরা তীর্থ-ভ্রমণে যাব আটজন যাত্রী, আর সঙ্গে যাবে সাতজন অনুযাত্রী। আটজনের হিসাব দিচ্ছি,—শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত মহারাজকুমার উদয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর বি-এ (তখন কিন্তু ইনি বি এ পাশ করেন নাই, তার পরে করেছেন) শ্রীযুক্ত রাজকুমার অভয়চাঁদ মহতাব বাহাদুর, শ্রীমান ভগবতীপ্রসাদ মেহেরা, শ্রীমান ললিতমোহন দাস (প্রাইভেট-সেক্রেটারী) শ্রীমান ফণীন্দ্রনাথ গুপ্ত এম-বি (সুতরাং চিকিৎসক), শ্রীমান রামেশ্বরপ্রসাদ বর্ম্মা (রাজ-চিত্রশিল্পী) আর আমি। সঙ্গে চাকর বাকর ও রন্ধনকারী ব্রাহ্মণে সাতজন।

গাড়ী ছাড়বে সেই সন্ধ্যার পর আটটা পঞ্চাশ মিনিটে বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসন থেকে; কিন্তু বিকাল থেকেই জিনিষপত্র রওনা হতে আরম্ভ হোলো। আমাদের উপর আদেশ জারী হোলো, আমরা যেন সেদিন কোথাও ভ্রমণে না যাই। এই ভাবে সারা দিন কাটিয়ে, সন্ধ্যা লাগতে-না-লাগতেই রাত্রির ভোজন শেষ করে, আমরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম। সওয়া সাতটার সময় আরদালী এসে সংবাদ দিল—গাড়ী হাজির। আমরাও হাজির! তখন দুর্গা দুর্গা ব'লে আমরা চার জন এক গাড়ীতে ষ্টেসনে যাত্রা করলাম। ষ্টেসনে গিয়ে দেখি আমাদের সব মালপত্র গাড়ীতে উঠে গিয়েছে। এখানি মাদ্রাজ মেল;

ইনি বাঙ্গালোর থেকে মাদ্রাজ পর্য্যন্ত যাবেন। আমাদের অত-দূর যেতে হবে না; আমরা জলারপেট জংসনে গাড়ী বদল করে মাঙ্গালোর মেলে যাব। তবে, আমাদের গাড়ী থেকে নেমে অন্য গাড়ীতে গিয়ে চড়তে হবে না, কারণ আমাদের গাড়ীখানি জলারপেট ষ্টেসনে রাত একটার সময় কেটে নিয়ে মাঙ্গালোর মেলে জুড়ে দেবে। আমাদের একখানি গোটা গাড়ী রিজার্ভ করা হয়েছিল, তাতে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী দুই-ই ছিল। আমাদের পর্ব্বতপ্রমাণ লগেজাদির কিছুই 'বুক' করা হোলো না, সবই গাড়ীর গর্ভে স্থান প্রাপ্ত হোলো, অর্থাৎ কোন রকমে আমাদের বিছানা পাতবার বেঞ্চ-কখানি জেগে থাকলেন, আর সব লগেজে পরিপূর্ণ। আটটার সময় শ্রীযুক্ত মহারাজ, কুমারদ্বয় ও ভগবতী ষ্টেসনে এলেন; আর আকাশ ভেঙ্গে বৃষ্টি নামল; আমরা যে যার কক্ষে আশ্রয় নিলাম। জলারপেটে গাড়ী বদলের ভয়ে ভৃত্যেরা আমাদের গাড়ীর লগেজের মধ্যেই যে যেখানে পারল স্থান করে নিল; কিন্তু পাচক ব্রাহ্মণ দুইজন হুজুরের হুকুম ঠিক-ঠিক তামিল করবার জন্য তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ীতেই উঠেছিল। তার ফলে পরদিন প্রাতঃকালে তাদের আর সন্ধান পাওয়া গেল না। তারা আমাদের দেশী [illegible]চারী ব্রাহ্মণ; ও-দেশেও কখন যায় নাই; কোথায় জলারপে[illegible] খবরও রাখে না। বেচারীরা একেবারে মাদ্রাজে গিয়ে পৌঁছেছিল এবং তার পরদিন বাঙ্গালোরে ফিরে গিয়েছিল। তাদের অদৃষ্টে রামেশ্বর দর্শন নেই, আর আমাদের অদৃষ্টে বিধাতা হিন্দুস্থানী 'মহারাজ'দের প্রস্তুত খাদ্য মাপিয়েছিলেন, তাই তারা এই ভাবে অন্তর্হিত হোলো।

এইখানে আমাদের পাঁচদিনের ভ্রমণ-লেখ (Programme) দিচ্ছি। এতে একেবারে ঘণ্টা মিনিট হিসাব করে আমাদের পাঁচদিনের গতিবিধি নিয়মিত হয়েছে। এর আর রদ-বদল হ'বার উপায় ছিল না; কারণ আমরা

যখন যেখানে পৌঁছিব, সেখানকার গবর্ণমেণ্টের প্রধান রাজকর্ম্মচারী, পুলিশের কর্ত্তৃপক্ষ এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকদিগের নিকট পূর্ব্বেই সংবাদ পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; আমাদের যান-বাহন যথাসময়ে যথাস্থানে উপস্থিত রাখবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল ; যে যে মন্দির দেখ্‌তে যাওয়া হবে, অন্য যে সকল দ্রষ্টব্য স্থানে যাওয়া হবে, সে সকল স্থানে সংবাদ দেওয়া ছিল, পাণ্ডাদের খবর করা ছিল। এ অবস্থায়, আমাদের ভ্রমণ-তালিকার একটু পরিবর্ত্তনও করবার যো ছিল না ; যথাসময়ে যথাস্থানে না গেলেই সব আগাগোড়া উলট্-পালট্ ; আর তার অর্থ যথেষ্ট অসুবিধা।

আমাদের গতিবিধির বিবরণ (Programme)

সোমবার ২৮শে সেপ্টেম্বর—বাঙ্গালোর সিটি ষ্টেসন হইতে যাত্রা, রাত্রি ৮-৫০ মিনিট (৮ নং মাদ্রাজ মেল)

মঙ্গলবার ২৯শে সেপ্টেম্বর—জলারপেট জংসন (রাত্রি ১২—১৫ মিনিট)

ঐ ঐ জলারপেট ত্যাগ—রাত্রি ১—১৫ (নং ১২, ডাউন মাঙ্গালোর মেল [এখানে আমাদের গাড়ী কাটিয়া মাঙ্গালোর মেলে জুড়িয়া দিবে]

ঐ ঐ এরোদ, প্রাতঃকালে ৫—২০ মিনিট (মাঙ্গালোর মেল ত্যাগ) [এনিষপক্ষ আমাদের জন্য একখানি ফ্যামিলি সেলুন থাকিবে এবং কয়েকটী দ্বিতীয় শ্রেণীর আসন রিজার্ভ থাকিবে। এই সেলুন এখানে প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে]

ঐ ঐ এরোদ ত্যাগ—প্রাতে ৬—১০ মিনিটে (নং ২২, ডাউন প্যাসেঞ্জার গাড়ী)

ঐ ঐ ত্রিচিনোপলী জংসন ১২—৩০ মিনিটে

মঙ্গলবার ২৯শে সেপ্টেম্বর—একটার সময় মোটর-যোগে তাঞ্জোর যাত্রা ও সন্ধ্যার পর প্রত্যাগমন।

ঐ ঐ ত্রিচিনোপলী ত্যাগ রাত্রি ৯—৪০ মিনিটে (নং ৩ আপ্ রামেশ্বরম্ এক্সপ্রেস)

বুধবার ৩০শে সেপ্টেম্বর, রামেশ্বরম্, প্রাতঃকালে ৭—১৩ মিনিটে [রামেশ্বরম্ দর্শন ও পূজা ইত্যাদি]

ঐ ঐ রামেশ্বরম্ ত্যাগ ২—৩০ মিনিটে (কুলী ট্রেণের সহিত সেলুন জুড়িয়া দিবে)

ঐ ঐ ধনুষ্কোটী ৩—০ মিনিটে।

ঐ ঐ ধনুষ্কোটী ত্যাগ সন্ধ্যা ৬—০ (নং ৪, ডাউন রামেশ্বরম্ এক্স্প্রেস)

ঐ ঐ মাতুরা রাত্রি ১১—২৫ মিনিটে

বৃহস্পতিবার, ১লা অক্টোবর, মাতুরা ত্যাগ রাত্রি ৯—৩৫ মিনিটে (নং ৩৪, ডাউন প্যাসেঞ্জার) [সমস্ত দিন মাতুরা ভ্রমণ]

শুক্রবার, ২রা অক্টোবর, ত্রিচিনোপলী পুনরাগমন ভোর ৪—১৫ মিনিটে

ঐ ঐ ত্রিচিনোপলী ত্যাগ ১—৩৫ মিনিটে (নং ২১, আপ প্যাসেঞ্জার)

ঐ ঐ এরোদে উপস্থিতি সন্ধ্যা ৭—১৫ মিনিটে (এইখানে সেলুন ত্যাগ)

ঐ ঐ এরোদ ত্যাগ রাত্রি ৯—৪৮ মিনিটে (নং ১১, মাঙ্গালোর মেলে)

শনিবার ৩রা অক্টোবর জলারপেট রাত্রি ২—৬ মিনিটে (এইখানে আমাদের গাড়ী বাঙ্গালোর মেলে জুড়িয়া দিবে)

শনিবার ৩রা অক্টোবর—জলারপেট ত্যাগ ... ২—৩০ মিনিটে
(... বাঙ্গালোর মেল)
ঐ ঐ বাঙ্গালোর ক্যান্টনমেণ্ট ভোর ৬—১১ মিনিটে

২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৩ই আশ্বিন, মঙ্গলবার—

সেই যে বাঙ্গালোরে গাড়ীতে উঠে কম্বল গায়ে জড়িয়ে শয়ন করেছিলাম, তার পর আর সাড়াশব্দ ছিল না; জলারপেটে গাড়ী বদল করতে হবে না, সুতরাং নিশ্চিন্তে নিদ্রা দেওয়া গিয়েছিল। যদি কেউ না জাগিয়ে দিত, তা হোলে চাই কি বেলা আটটা পর্য্যন্ত অকাতবে নিদ্রা দিতে পারতাম। নিদ্রাব অপবাধ ছিল না; পূর্ব্বদিন রাত্রে মহিষুর থেকে ফিরবার সময় যদিও বার্থ বিজার্ভ ছিল, কিন্তু সঙ্গে বিছানাপত্র না থাকায় মোটেই ঘুম হয় নাই। তার পব বাঙ্গালোবেও দিনের বেলায় বিশ্রামেব অবকাশ হয় নাই; কাজেই সাবারাত্রি নিদ্রা দেওয়া বিশেষ অপবাধের কারণ হয় নাই। কিন্তু, সাবাবাত্রিই বা কৈ? আমাদেব গাড়ী ভোর পাঁচটা কুড়ি মিনিটে এরোদ পৌছিবে। এখানে আমাদের গাড়ী বদল করতে হবে। এখান থেকে আমরা South Indian Railway Co Ltd ব যাত্রী হব। রাত যখন চারটে, তখন কোন্ এক অজ্ঞাতনামা ষ্টেসনে একজন ভৃত্য এসে আমাদের জানিয়ে দিয়ে গেল যে, এখনই উঠে প্রস্তুত হ'তে হবে, একঘণ্টা পরেই এ গাড়ী ছেড়ে অন্য গাড়ীতে যেতে হবে। তখন আর কি করা যায়; সকলকেই উঠতে হোলো। এরোদের পূর্ব্ববর্ত্তী ষ্টেসনে মহারাজ স্বয়ং দেখে গেলেন আমরা প্রস্তুত হয়েছি কি না। সেই ভোরের পূর্ব্বে গভীব নিদ্রাভঙ্গ, তখন এক পেয়ালা চা যে

বড়ই আরামদায়ক, এ কথা মহারাজকে বলতে তিনি বললেন "কথাটা ঠিকই, কিন্তু সে যে হ'বার যো নেই। মোটঘাট বাঁধা রয়েছে; এখন সে সব খুলতে গেলে মহাবিভ্রাট। এরোদে নেমে দশ মিনিটের মধ্যে চা পাবেন, কেমন ?"

ঠিক পাঁচটা কুড়ি মিনিটে এরোদ ষ্টেসনে গাড়ী পৌঁছিল। ষ্টেসনে যথেষ্ট কুলী ছিল। তারা আমাদের মালপত্র নিয়ে ষ্টেসনের অপর দিকের প্ল্যাটফরমে মহারাজের জন্য নির্দ্দিষ্ট সেলুনে বোঝাই করতে আরম্ভ করল। আমরা রেলের উপরের সেতু পার হ'য়ে অপর প্ল্যাটফরমে গেলাম। গিয়েই দেখি রেলের রিফ্রেস্‌মেণ্ট রুমের আরদালীরা চা 'প্রভৃতি' নিয়ে হাজির। আমার চা-পানেব আগ্রহ বুঝতে পেবে শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর এরোদের এ-দিকের ষ্টেসনে আমার সঙ্গে কথাবার্ত্তার পরই এরোদে চা প্রস্তুত রাখবার জন্য তার করে দিয়েছিলেন। তাই সেখানে উপস্থিত হওয়া মাত্রই চা প্রস্তুত। আমার 'প্রভৃতি'র প্রয়োজন ছিল না; দুই পেয়ালা চা পান করে রাত চারটায় শয্যাত্যাগের ক্ষতিপূরণ করা গেল।

এখন গোল উপস্থিত হোলো থাকবার স্থান নিয়ে। ফ্যামিলি সেলুনে একটী বৈঠকখানা—ইংরাজীতে যাকে drawing room বলে, দুইটী ছোট ক্যাবিন, স্নানের ঘব, পাইখানা, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। স্থির হোলো, বৈঠকখানায় যে তিনখানি সোফা আছে, তাতে মহারাজ ও দুই কুমার বাহাদুর থাকবেন, পার্শ্বের একটা ক্যাবিনে শ্রীমান ভগবতী থাকবেন, অপর ক্যাবিনে আমি থাকব; আর একটু দূরে যে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরা রিজার্ভ হয়েছে, তাতে রামেশ্বর, ললিত ও ফণী যাবেন। আমি এ প্রস্তাব না-মঞ্জুর করলাম। আমি সেলুনের সেই অপরিসর পারাবতের কক্ষে থাকতে পারব না; ওটী সাহেব মানুষ ললিতমোহনের জন্যই নির্দ্দিষ্ট হোক। আমি যে অষ্টপ্রহর জামা গায়ে দিয়ে থাকব, তা কিছুতেই হ'বে

না। জামা ত্যাগ করে, হাঁটুর উপরে কাপড় তুলে না বস্‌লে আমার আরাম-বোধই হয় না। বিশেষতঃ, শ্রীমান রামেশ্বর আমার দক্ষিণ হস্ত, আমার অন্ধের যষ্টি; সে আমার পাশে না থাকলে আমার চারিদিক অন্ধকার। অতএব, আমি দ্বিতীয় শ্রেণীতেই মহা আরামে, মহা আনন্দে যাব। অগত্যা আমার প্রস্তাবই গৃহীত হোলো। মহারাজ ললিতকে বললেন "ওহে, তুমি তোমার ঐ সাহেবী পোষাক এ পাঁচদিনের জন্য খুলে ফেল; একেবারে ওঁর মত বাঙ্গালী হও। শুনলে ত বচন।" বলা বাহুল্য, এ কয়দিন ডাক্তার, ললিত ও রামেশ্বর, এই তিনজনকে বিলাতী পোষাক ত্যাগ করে বাঙ্গালী বাবু সাজতে হ'য়েছিল।

ছয়টা দশ মিনিটের সময় আমাদের গাড়ী ছাড়ল। এখানি ডাউন প্যাসেঞ্জার ট্রেণ। আমরা এরোদেই চা পান করেছিলাম; কিন্তু, তা হোলে কি হয়, আমাদের পাঁচদিনের জন্য যে গৃহস্বামী সেলুনে পাত হয়েছে, তারও ত প্রথম পরখ করতে হবে। সুতরাং রীতি সাতটার সময় চা ফলমূল মিষ্টান্ন সেলুন থেকে এলো। সেই সময়ই ভৃত্যের সংবাদ দিয়ে গেল যে, সাড়ে দশটায় আহার্য্য প্রস্তুত হ'ব। আমরা যেন সেই সময় কোন একটা ষ্টেসনে নেমে সেলুনে গিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন শেষ করে আসি। আমাদের কিন্তু মধ্যাহ্ন-ভোজনের তেমন দরকার ছিল না কারণ প্রত্যেক ষ্টেসনেই সুন্দর কদলী দর্শন করে এবং তার অসম্ভব সুলভ মূল্য শুনে শ্রীমান রামেশ্বর ক্রমাগত কিনতে আরম্ভ করেছিলেন; এবং সেগুলি বিশ্রামেরও অবকাশ পায় নাই।

তা হ'লেও দশটার পূর্ব্বেই আমরা গাড়ীর মধ্যে স্নানাদি শেষ করে প্রস্তুত হ'য়ে থাকলাম। দশটার সময় একটা ষ্টেসনে নেমে সেলুনে গিয়ে আহার করা গেল। বাঙ্গালী পাচক দুইটীর অন্তর্ধানে আমাদের আহারের যে কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটেছিল, তা মোটেই বুঝতে পারা গেল না।

মধ্যাহ্ন সাড়ে বারটার সময় আমাদের গাড়ী ত্রিচিনোপল্লী ষ্টেসনে পৌছিল। সেলুনখানি সাইডিংয়ে কেটে রেখে গাড়ী চ'লে গেল। পূর্ব্বের ষ্টেসনেই আমাদের কক্ষে যে বিছানা ও সুট-কেস প্রভৃতি ছিল, সমস্ত নিয়ে সেলুনে তুলে রাখা হয়েছিল। আমরা গাড়ী থেকে নেমে পড়লাম।

এই ত্রিচিনোপল্লীর পার্শ্ববর্ত্তী বিখ্যাত শ্রীরঙ্গমের সম্ভ্রান্ত অধিবাসী ও স্বদেশনায়ক কাউন্সিল অব ষ্টেটের মেম্বর মাননীয় শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয়কে আমাদের সেই দিনে ত্রিচিনোপল্লী উপস্থিত হ'বার সংবাদ দেওয়া ছিল; এবং আমরা যে মোটর-যোগে তাঞ্জোর যাব, তার ব্যবস্থা করবারও সংবাদ দেওয়া ছিল। এতদ্ব্যতীত আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের আয়োজন-সহ ষ্টেসনে উপস্থিত থাকবার কথাও বলা ছিল। শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় সেদিন বিশেষ প্রয়োজনীয় কার্য্য-উপলক্ষে মাদ্রাজে থাকায় ষ্টেসনে আসতে পারেন নাই; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় সদলবলে অর্থাৎ যথেষ্ট খাদ্যসম্ভার সহ ষ্টেসনে উপস্থিত ছিলেন। ভদ্রলোক এত অধিক পরিমাণে নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য এনেছিলেন যে, আমাদের সকলের তিন বেলা তাতেই চ'লে যেতে পারে। তখন ষ্টেসনের বিশ্রাম-গৃহ ছেড়ে আমাদিগকে সেলুনে যেতে হোলো। মহারাজ বললেন "আমরা এই সকল সুখাদ্যের একটু একটু আস্বাদ নিয়েছি; আপনারাও নিন। ওরে বাবা, কিছু যদি মুখে দেওয়া যায়। এদের যা উৎকৃষ্ট খাদ্য, তাই এরা এনেছে; কিন্তু এ সব পোলাও মিষ্টান্ন মুখে দেওয়া যে আমাদের পক্ষে অসম্ভব—একেবারে তেঁতুল আর লঙ্কার মহাধিবেশন।" তারপর শ্রীমান ললিতের দিকে চেয়ে বললেন "দেখুন, ললিত কিন্তু গাড়ীতে খাবার তৈরী করবার বিরোধী ছিল। ও বলেছিল, 'ভদ্রলোকদের খাবার আন্‌বার জন্য সংবাদ দেওয়া

আছে ; তারা নিশ্চয়ই আন্‌বে।' যদি ললিতের পরামর্শ শোনা যেত, তা হ'লে এবেলা উপবাস হোতো। ওহে ললিত, খাবারগুলোর সদ্ব্যবহার কর না।" কিন্তু, কার সাধ্য যে সেই লঙ্কা কাণ্ডে যোগ দেয়। খাবারগুলি না কি আমাদের তাঞ্জোর যাত্রার পর কাঙ্গালীদিগের মধ্যে বিতরিত হ'য়েছিল।

তাঞ্জোর

শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার মহাশয় আমাদের জন্য তিনখানি মোটর ষ্টেসনে রেখেছিলেন। আমরা এ-দিনে ত্রিচিনোপলী বা শ্রীরঙ্গম্ সহরের মধ্যে কোথাও যাব না; বরাবর তাঞ্জোরে যাব এবং সেখান থেকে ফিরেই সন্ধ্যার পরের ট্রেণে রামেশ্বরম্ যাত্রা করব।

বেলা দেড়টার সময় আমরা মোটরে তাঞ্জোর যাত্রা করিলাম। প্রথম মোটরে আরোহী হলেন শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুর, শ্রীযুক্ত ছোটকুমার বাহাদুর ও শ্রীমান ভগবতী; দ্বিতীয় মোটরে শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও শ্রীমান ললিত; তৃতীয় মোটরে ডাক্তার ফণী, রামেশ্বর ও আমি।

ত্রিচিনোপলী থেকে তাঞ্জোর ৩৬ মাইল। তাঞ্জোরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং মন্দিরাদির কর্তৃপক্ষকে পূর্ব্বেই সংবাদ দেওয়া ছিল যে, আমরা ঐ দিন অপরাহ্ণ তিনটার সময় তাঞ্জোর পৌঁছিব। তাঁহারা তদনুসারে মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য যথোপযুক্ত আয়োজন করে রেখেছিলেন। আমাদের মধ্যে কয়েকজনের ভাগ্যে কিন্তু সে সমারোহ আয়োজনের শেষাংশ মাত্র দৃষ্ট হয়েছিল; কারণ আমাদের মোটর নানা গোলযোগ বাধিয়ে গমনে বিলম্ব করে বসেছিল।

তিনখানি মোটর আগে-পিছে রওনা হোলো; মহারাজের মোটর একটু দ্রুতগতিতে অগ্রসর হ'য়েছিল। আমাদের মোটরখানি যখন এগার মাইলের কাছে গিয়েছে, তখন দেখি দ্বিতীয় মোটরখানি অসমর্থ হয়ে

পথের পার্শ্বে দণ্ডায়মান। আমরা যানের গতিরোধ করে মোটরে কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, বিশেষ কিছু হয় নাই, টায়ারে একটু দোষ হয়েছে, দশ-পনর মিনিটের মধ্যেই মেরামত হয়ে যাবে শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বললেন "মহারাজের গাড়ী চলে গিয়েছে, আপনারাও যান, দশ পনব মিনিট পবে আমরাও আস্‌ছি।"

আমরা তখন তাঁদের জন্য অপেক্ষা না করে অগ্রসর হলাম। ২১ মাইল গিয়ে দেখি, আমাদের কোন গাড়ীই আস্‌তে না দেখে মহারাজ এক বৃক্ষমূলে অপেক্ষা করছেন। আমবা বিলম্বেব কারণ বল্‌লাম। প্রায় দশ মিনিট অপেক্ষা কবেও যখন দ্বিতীয় গাড়ী দেখ্‌তে পাওয়া গেল না, তখন আমি বল্‌লাম "পথের মধ্যে সবাই ব'সে থেকে কি হ'বে। আপনি অগ্রসব হ'ন। আমবা এখানে প্রতীক্ষা কবি। তাঁবা এলে দুই গাড়ী একসঙ্গে ছাড়ব।" মহারাজ তাহাই সুযুক্তি মনে কবে চ'লে গেলেন। আমবা সেইখানে ব'সে রইলাম।

চাবটা বেজে গেল, তখনও তাঁদের দেখা নেই। আমি খন বল্‌লাম "তাঞ্জোর দেখা হয় হবে, না হয় না হবে, পিছনের গাড়ী এলে আমবা তাঞ্জোবের দিকে যাব না। এখানে ব'সে থাকার চাইতে দশ মাইল ফিবে গিয়ে দেখি, তাঁদের কি অবস্থা হয়েছে।" তাই স্থির হোলো। আমরা মোটব ফিরিয়ে দ্রুতগতি সেই এগার নম্ববে গিয়ে দেখি, সে মোটরখানি একেবারে বিগড়ে গিয়েছে, তার আর চলবার শক্তি নেই। তখন আমাদের মোটবেই তাঁদের তিনজনকে তুলে নেওয়া হোলো। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গাব মহাশয় মোটব-চালনার ভাব নিলেন। তিনি আশ্বাস দিলেন যে, যে কোরেই হোক আমাদের দিনের আলো থাক্‌তে থাক্‌তে তাঞ্জোরে পৌঁছিয়ে দেবেন এবং তা হোলেই তাড়াতাড়ি মন্দিরগুলি দেখা হবে। তথাস্তু!

যখন আমরা ত্রিশ মাইল গিয়েছি, সম্মুখে আরও ছয় মাইল বাকী,

তখন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হ'য়ে এল। আমরা বুঝতে পারলাম আমাদের আর তাঞ্জোরের মন্দিরাদি দেখা হবে না, তবে সহরটা ঘুরে আসা হবে এবং বৃষ্টিতে কষ্ট পাওয়া হবে। আমাদের সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যক্রমে মেঘ
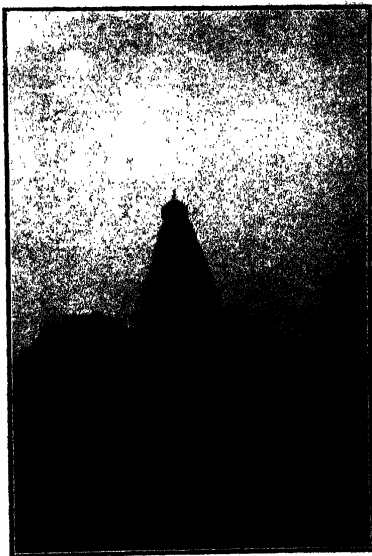
প্রধান মন্দিব—তাঞ্জোর

যেন ত্রিচিনোপলীর দিকে চলে গেল,—সৌভাগ্য এই জন্য যে আমরা তাঞ্জোরে যেতে পারব; আর দুর্ভাগ্যেব কথা পবে বলব।

সহর থেকে যখন আমবা তিন মাইল দূরে, সেই সময় সহরের দিক

থেকে একখানি মোটর আসছে দেখা গেল। আমরা মনে করলাম, মহারাজই আমাদের বিলম্ব দেখে ফিরে আসছেন। কিন্তু, তা নয়। মোটরখানি আমাদের কাছে আসতেই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় আমাদের মোটর থামালেন ; অপর মোটরেরও গতিরোধ হোলো। সে মোটরের আরোহী ও চালক একজন সাহেব। আয়েঙ্গার মহাশয় তাঁর পরিচয় দিলেন, তিনি তাঞ্জোরের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ হুড আই সি এস। তিনি বললেন, আমাদের বিলম্ব দেখে মহারাজ বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছেন ; তাই তিনি স্বয়ং আমাদের খোঁজে এসেছেন। তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রীযুক্ত বিরাজকুমারকে তাঁর মোটরে তুলে দিয়ে আমরা পশ্চাদ্‌বর্ত্তী হ'লাম।

আমরা যখন তাঞ্জোরের বৃহদীশ্বর মন্দিরের কাছে গেলাম, তখনও একটু বেলা আছে। মন্দিরের দ্বারেই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হোলো। বিরাজকুমারকে নিয়ে কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁর বাঙ্গালায় চলে গিয়েছেন ; সেখানে তাঁদের জন্য বৈকালিক জলযোগের ব্যবস্থা ছিল। মহারাজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বাঙ্গালার দিকে চলে গেলেন ; আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মহারাজের আগমন উপলক্ষে মন্দির-প্রাঙ্গণ সুসজ্জিত হয়েছিল ; বাজনাদার, হাতী, ঘোড়া অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত ছিল। প্রাঙ্গণে অনেক আসন সজ্জিত ছিল ; পুষ্পমাল্য, নারিকেল, পানসুপারী প্রভৃতিরও আয়োজন হ'য়েছিল। মহারাজের অভ্যর্থনা আমরা দেখতে পাই নাই, কিন্তু আমাদের রাজোচিত অভ্যর্থনা দেখেই সে অভ্যর্থনার গুরুত্ব উপলব্ধি হোলো।

মন্দিরগুলি যদিও তাড়াতাড়ি দেখা হোলো, তা হ'লেও যা দেখলাম, তা অপূর্ব্ব! এইখানে তাঞ্জোরের মন্দিরাদি সম্বন্ধে যে বিবরণ আমি সংগ্রহ করেছিলাম, তা লিপিবদ্ধ করছি।

পুরাকালে এই প্রদেশে এক মহাপরাক্রমশালী রাক্ষস বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল তান্জান। ইনি বংশমর্য্যাদায়ও বড় ছিলেন; কারণ ইনি মহাপ্রতাপান্বিত মধু ও কৈটভের অন্যতর মধুর বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ইহাঁর অত্যাচারে এ-দেশের শান্তিপ্রিয় লোকজন একেবারে অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠেছিলেন। তখন, আর সকলে, এমন কি দেবতারা পর্য্যন্তও, যা আবহমান কাল করে আস্ছেন, এখানকার লোকেরাও তাই করলেন—বিষ্ণুর কাছে গিয়ে তাঁদের দুরবস্থার কথা জানিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। আশ্রিতবৎসল শ্রীবিষ্ণু আর্ত্তের পরিত্রাণের জন্য নীল-মেঘ-পেরুমল নামে অবতীর্ণ হয়ে রাক্ষসকে নিধন করে রাজ্যে শান্তি স্থাপন করলেন। এই ঘটনা চিরস্মরণীয় করবার জন্য নীলমেঘ-পেরুমলের পূজার জন্য মন্দির নির্ম্মিত হোলো এবং স্থানের নাম হোলো তাঞ্জোর; রাক্ষস তান্জানের নামও স্মরণীয় হ'য়ে রইল। সেই মন্দির না কি এখনও বর্ত্তমান তাঞ্জোর থেকে মাইল তিনেক দূরে জঙ্গলের মধ্যে স্তূপে পরিণত হ'য়ে রয়েছেন।

তাঞ্জোর বহুকাল চোল রাজ্যের রাজধানী ছিল। চোল-বংশের প্রখ্যাতনামা রাজা রাজেন্দ্র চোলের রাজত্ব সময়ে এই বৃহদীশ্বর মন্দির নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরের কারুকার্য্য দর্শন করলে বিস্মিত হ'তে হয়। মন্দিরের চারিপার্শ্বে যে দুর্গপ্রাচীর ও পরিখা রয়েছে, সে সব এই মন্দির-রক্ষার্থ নায়েক রাজাদিগের আমলে নির্ম্মিত হয়েছিল। বৃহদীশ্বর মন্দির নির্ম্মাণের জন্য যে স্থপতি নিযুক্ত হয়েছিল তাহার বাড়ী এ-দেশে ছিল না; তাহাকে কন্জিভরম্ বা কাঞ্চী থেকে আনা হয়। এই লোকটী যে স্থাপত্য-বিদ্যায় অনন্য-সাধারণ প্রতিভাশালী ছিল, তার প্রমাণ এই বৃহদীশ্বর মন্দিরের কারুকার্য্য। এতদ্ব্যতীত এই লোকটী সম্বন্ধে আর একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে। এই স্থপতিবর ভবিষ্যদ্‌দ্রষ্টা ছিল। তাহার প্রমাণ সে

এই মন্দির-গাত্রে মূর্ত্তি উৎকীর্ণ করে অবিনশ্বর করেছে। এই লোকটী ভবিষ্যৎ ভারতের ইতিহাস ও রাষ্ট্র পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এই বৃহদীশ্বর মন্দিরের বিমানে মূর্ত্তির দ্বারা প্রকাশ করে গিয়েছে। এই দেশে চোল রাজবংশের পর যে নায়কদিগের অধিকার সংস্থাপিত হ'বে, তার পর যে মহারাষ্ট্রীয়েরা এ-দেশে আধিপত্য বিস্তার করবে এবং তার পর যে ইউরোপীয়গণ এ-দেশে প্রাধান্য লাভ করবে, এই ভবিষ্যৎ ইতিহাস স্থপতি-বরের ভবিষ্যদ্দৃষ্টির সম্মুখে প্রতিভাত হ'য়েছিল। তাই সে মন্দিরের বিমানে বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস ও মোটামুটি ঘটনাবলী মূর্ত্তির সাহায্যে দেখিয়েছিল। এই স্থানে আমার কিন্তু একটা খট্‌কা লেগেছিল। স্থপতি মহাশয় বিভিন্ন অধিকারের চিত্র দিতে গিয়ে মুসলমান রাজবংশকে বাদ দিলেন কেন? দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজত্বের অবসানে মারাঠাদের আমলে ত মুসলমানগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। তাদের কথা বা তাদের চিত্র এই মন্দিরগাত্রে দেওয়া হয় নাই কেন? যদি বলা হয় যে, হিন্দুর মন্দিরে অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদিগের চিত্র ধর্ম্মানুমোদিত হ'বে না বলেই স্থপতি সেটা বাদ দিয়েছেন, কিন্তু, সে কথাও ত খাটে না। ইউরোপীয়ানগণও ত বিধর্ম্মী! সে বিচারের ভার ঐতিহাসি-কের উপর দিয়ে, আমরা সেই স্থপতি-প্রবরের স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি। সত্য সত্যই, যে ব্যক্তি তাঞ্জোরের এই সুবৃহৎ মন্দিরের পরিকল্পনা করেছিল এবং তা মূর্ত্ত করে তুলেছিল, সে ব্যক্তি সকলেরই নমস্য। সুধু তাঞ্জোর ব'লে নয়, দক্ষিণাপথে যেখানে যে সকল মন্দির দেখেছি, তার সকলেরই নির্ম্মাতা এই দেশেরই লোক। ইহা কি কম গৌরবের কথা!

বৃহদীশ্বর মন্দিরের পরই তাঞ্জোরের অপর দ্রষ্টব্য স্থান রাজপ্রাসাদ। অনেকখানি জমি জুড়ে এই বহু পুরাতন রাজপ্রাসাদ। ইহার চারি

দিকে প্রাচীর ও পরিখা-বেষ্টিত। রাজপ্রাসাদের মধ্যে সূর্য্য-ঘড়ি ছিল, তাহার প্রমাণ এখনও বিদ্যমান। প্রাসাদের এক পার্শ্বে কৃষ্ণ-বিলাস নামক সরোবর। এই সরোবরের তীরে অনেক মূর্ত্তি স্থাপিত

ধ্বজা ও মন্দির—তাঞ্জোর

আছে। সরোবরটী দেখিবার যোগ্য বটে। প্রাসাদের অভ্যন্তরে দুইটী সুপ্রশস্ত দরবার-কক্ষ আছে—একটী নায়কদিগের আমলের, দ্বিতীয়টী মারাঠাদিগের সময়ের। যাহাকে এখন নায়কদিগের দরবার-কক্ষ ব'লে

অভিহিত করা হয়, তাহার পূর্ব্ব নাম ছিল লক্ষ্মী-বিলাস। এই লক্ষ্মী-বিলাস দরবার-গৃহে বিজয় রঙ্গনাথ নায়কের রাজ্যাভিষেক-ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়। তাহা হইলে এই দরবার-গৃহ যে সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়েছিল, এ কথা বলা যেতে পারে।

বৃহদীশ্বরের মন্দির যে অতি পুবাতন, তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। চোল রাজ রাজরাজেশ্বর এই মন্দিরের জন্য বহু অর্থ ও ভূমি দান করে গিয়েছিলেন। এই রাজা অতি প্রতাপশালী ছিলেন। তিনি সমগ্র মাদ্রাজ অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। বোম্বাই প্রদেশেরও অনেক স্থান তিনি অধিকার করেছিলেন; এমন কি সিংহল দ্বীপও তিনি দখল করেছিলেন। তাঁর কীর্ত্তি-কাহিনী 'রাজরাজেশ্বর নাটক' নামক একখানি দৃশ্যকাব্যে লিপিবদ্ধ আছে। পণ্ডিতেরা বলেন, এই দৃশ্যকাব্যখানি ১০৫৫ খৃষ্টাব্দে রচিত হয়েছিল। তা হলে, এ কথা বলা যেতে পারে যে, বৃহদীশ্বরের মন্দির খৃষ্টিয় একাদশ শতকের অনেক পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়েছিল।

আমাদের দুর্ভাগ্য তাঞ্জোর সহরটী আমরা সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখে-ছিলাম। সুতরাং সহরের বর্ণনা অন্ধকারাচ্ছন্নই থাক্‌ল।

এইবার আমাদের ফিরবার ব্যবস্থা। তখন প্রায় ৭টা, আমাদের ট্রেণ ত্রিচিনোপলী থেকে রাত্রি ৯-৪০ মিনিটে ছাড়বে। এই অন্ধকারে যেতে হবে ৩৬ মাইল পথ। আকাশে তখন ঘন মেঘ। একখানি মোটর নিয়ে আমরা চারি জনে যাত্রা করলাম। আমাদের মনে হয়েছিল, শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর ছেলেদের নিয়ে হয় ত পূর্ব্বেই বেরিয়ে গেছেন। তাঞ্জোর থেকে তিন মাইল গেলে একটা পুলিশ ষ্টেসন পাওয়া যায়। আমাদের গাড়ী যখন সেই পুলিশ ষ্টেসনের সম্মুখে এল, তখন পুলিশের লোকেরা আমাদের গাড়ী আট্‌কিয়ে বল্‌ল যে,

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব হুকুম দিয়েছেন, তাঁর বাংলা থেকে মহারাজের গাড়ী না আসা পর্য্যন্ত আমবা যেন সেখানে অপেক্ষা করি। এ হুকুম ত আব অমান্য কবা যায় না। দশ মিনিট অপেক্ষা কবাব পর দূরে
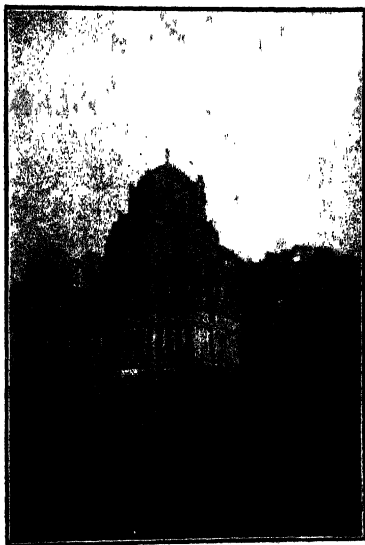
গণেশ মন্দিব—তাঞ্জোব

দুখানি মোটবেব প্রজ্বলিত চক্ষু দেখতে পাওয়া গেল। একটু পরেই মোটব দুখানি আমাদেব কাছে এসে উপস্থিত হ'ল। একখানি মহাবাজেব সেই পূর্ব্বের মোটব, অপব খানি তাঞ্জোরের এক ধনী

মহাজন আমাদের ত্রিশিনোপলী পৌঁছিয়ে দেবার জন্য দিয়েছেন। আমরা তখন ভাগাভাগি ক'রে তিনখানি মোটরে সওয়ার হ'য়ে যাত্রা আরম্ভ করলাম। খানিক দূর এসেই বেশ বুঝতে পারা গেল যে, এদিকে খুব ঝড় বৃষ্টি হয়ে গেছে। তাঞ্জোরে কিন্তু আমরা মেঘই দেখেছিলাম, বৃষ্টি বা ঝড় পাই নি। আর খানিকটা অগ্রসর হ'য়েই আমাদের তিনখানি মোটরই থেমে গেল। কি ব্যাপার! না, রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই আমরা এই পথে গিয়েছি; রাস্তা ঠিক ছিল,—এখন কিসে বন্ধ হ'ল! সকলে তখন গাড়ী থেকে নেমে দেখি, প্রকাণ্ড এক অশ্বত্থ বৃক্ষ শিকড় শুদ্ধ উপড়ে প'ড়ে সমস্ত পথটা বন্ধ করে ভূমিশায়ী হয়ে আছেন। আশে-পাশে লোকালয়ও নেই যে লোকজন ডেকে গাছটাকে সরিয়ে পথ করে নিই। আর লোক পেলেই বা কি! সেই প্রকাণ্ড গাছকে সরাতে গেলে যেমন করে হোক্ দু'শো লোকের দরকার। এই দু'শো লোক মিলে গাছটাকে কেটে রাস্তা পরিষ্কার করতে হলে, সে রাত ত যাবেই, পরের দিনেও কুলিয়ে উঠবে কি না সন্দেহ! এদিকে আমাদের গাড়ী কিন্তু ৯-৪০ মিনিটে।

তখন আমরা অসাধ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হলাম। সবাই মিলে গাছের ডাল ভাঙ্গতে আরম্ভ করে দিলাম। মহারাজ থেকে আরম্ভ করে চালক পর্য্যন্ত সকলেই সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গছি। কিন্তু ডাল ভাঙ্গলে কি হবে; গাছের প্রকাণ্ড কাণ্ড একেবারে পথ জুড়ে শুয়ে আছেন। রাস্তার দু'পাশে জমি; তাতে বৃষ্টির জল দাঁড়িয়েছে। সে জমির অবস্থা কি এবং জলই বা কতখানি দাঁড়িয়েছে, মোটরের হেড্ লাইটের সাহায্যে তা ঠিক করা গেল না। কোনও উপায় না দেখে, আমাদের সঙ্গী শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় বল্লেন,

"আর যখন কোন উপায়ই দেখা যাচ্ছে না, তখন আমি একখানি মোটর নিয়ে মাঠে নেমে পড়ি। যদি মাঠ ভেঙ্গে ও-পাশে রাস্তায় উঠতে পারি, তাহ'লে আর দুখানিকেও সেই পথই অবলম্বন করতে হবে। আর যদি আমার মোটর মাঠের মধ্যে জল-কাদায় আটকে যায়, তা হলে আর কোন উপায় নেই।"

আয়েঙ্গার মহাশয় যে সুদক্ষ মোটর-চালক, তা আমরা যাবার সময়েই জানতে পেরেছিলাম। তিনি তখন মোটরে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে মাঠে নেমে পড়লেন। আমরা কিন্তু তখনও গাছের ডালই ভাঙ্গছি।

এমন সময় রাস্তা দিয়ে গুটি-চারেক কুলি এসে উপস্থিত হ'ল। তাদের দুজনের কাঁধে দুখানি কোদালি। আমরা তাদের আটক করলাম। তারা বলে "কোদালি দিয়ে গাছ কাটব কি করে! আর তা সম্ভব হলেও এত বড় কাণ্ড কাটতে দুদিন সময় লাগবে।" তবুও তাদের ছাড়া হোল না, রাস্তার পাশের দিকে যে জঙ্গল ছিল, তাই পরিষ্কার করতে তাদের লাগিয়ে দেওয়া গেল। আমরা তখন গাছের ডাল ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে হাঁপিয়ে উঠেছি; মহারাজ ও কুমারদ্বয়ের বহুমূল্য পোষাক বটের আটায় ও রাস্তার কাদায় একেবারে মলিন হয়ে গিয়েছে; তাঁদের আর হাত নাড়বার যো নেই, এমন হয়েছে। আমরাই অবসন্ন হয়ে পড়েছিলাম, তাঁদের ত কথাই নেই!

ও-দিকে আয়েঙ্গার মহাশয় যখন মাঠের জল-কাদা ভেঙ্গে অপর দিকে রাস্তায় উঠেছেন, সেই সময় আমাদের দুই গাড়ীর চালক বল্ল যে, রাস্তার পাশে যে জঙ্গল পরিষ্কার হয়েছে, সেইখান দিয়ে মোটর চালিয়ে তারা গাছ ডিঙ্গিয়ে যেতে পারবে। তাই হোল। এক-খানি মোটর খানিকটা পিছু হ'টে এমন জোরে গাড়ী চালিয়ে দিল

যে, অশ্বত্থগাছের মাথার দিকের একটা কাণ্ড অতি কষ্টে অতিক্রম করে গেল। তৃতীয় মোটরখানি আর সে সাহস পেল না; সে হেতু লাইট জ্বেলে দিয়ে আয়েঙ্গার মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে মাঠে নেমে পড়ল এবং অনেক ধস্তাধস্তি করে ও-পাশের রাস্তায় উঠ্‌ল। তখন রাত সাড়ে-আটটা বাজে-বাজে। তিনখানি মোটরই যখন রাস্তায় এসে প্রস্তুত হ'ল, তখন আর বিলম্ব না করে, ঊর্দ্ধশ্বাসে গাড়ী ছুটল। এ স্থানটা বোধ হ'ল, ত্রিচিনোপলী থেকে কুড়ি মাইল দূরে। আমাদেব সম্মুখের দুখানি গাড়ী দেখতে দেখ্‌তে অদৃশ্য হয়ে গেল, আমরাই পিছনে পড়লাম।

ত্রিচিনোপলী যখন চার মাইল দূরে, তখন আমাদের মোটব জবাব দিয়ে বস্‌ল। রামেশ্বর ঘড়ি খুলে দেখল, ৯ বেজে কুড়ি মিনিট হয়েছে। মহা বিপদ! কুড়ি মিনিট মাত্র সময়, সম্মুখে চাব মাইল পথ। যা হোক্ ৪।৫ মিনিটের মধ্যেই মোটব ঠিক হয়ে গেল। তখন দেঁ ছুট্!

এদিকে ষ্টেশনে আর দুখানি মোটর আগেই আমাদের পৌঁছে পথ-চেয়ে আছে। যখন গাড়ী ছাড়তে দশ মিনিট বাকী, তখনও আমরা পৌঁছাতে পারিনি দেখে মহারাজ ষ্টেসন থেকে আর একখানি মোটর আমাদের খোঁজে পাঠিয়ে দিলেন। প্রায় দু মাইলের পরে সেই মোটরের সঙ্গে আমাদেব দেখা। আমাদের মোটর তখন ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ছে। সুতরাং প্রেরিত মোটরের সাহায্য গ্রহণ করার আর প্রয়োজন হ'ল না। ষ্টেসনে যখন পৌঁছিলাম, তখন গাড়ী ছাড়তে তিন মিনিট বাকী। আমাদের সেই কর্দ্দমাক্ত চেহারা দেখে প্ল্যাটফরমের লোকেরা কি মনে করেছিল জানি না, আর যখন আমাদের জানবারও অবকাশ ছিল না। দৌড়ে গিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। মিনিট-খানেক পরেই গাড়ী ছেড়ে দিল। সেই রাত্রিতে

ছু-তিনখানি সাবান গায়ে ঘষেও বটের আটা আর তুলতে পারা গেল না। কাপড় জামা চাদর একেবারে বাতিল হয়ে গেল। অত-রাত্রে গাড়ীর মধ্যে স্নান করে তবে আমরা সুস্থ হই।

গোপুরম্—তাঞ্জোর

গাড়ী ছেড়ে দিয়েছে, আমরাও স্নান সেরে নিয়েছি, তখন এমন ক্ষুধার উদ্রেক হ'ল যে, তা আর বলবার নয়। ক্ষুধারও অপরাধ ছিল না। দশটার পর একটা ষ্টেসনে গাড়ী থামতেই দেখি, ভৃত্যেরা

আমাদের জন্য আহার্য্য দ্রব্য নিয়ে এল। আমরা যে এত পরিশ্রমের পর সেলুনে খেতে যেতে পারব না, এই বুঝেই আমাদের খাবার আমাদের গাড়ীতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমরা এক-এক জনে তিন জনের আহার্য্য দ্রব্যের সদ্ব্যবহার ক'রে শুয়ে পড়লাম। রাত যে কোন দিক দিয়ে গেল, জানতেও পারলাম না।

রামেশ্বরম্

৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৪ই আশ্বিন, বুধবার।

রাত্রিটা গাড়ীতে এক ঘুমে কেটে গেল,—যে পরিশ্রম হয়েছিল। প্রাতঃকালে যেখানে ঘুম ভাঙ্গল, সেখানকার নাম 'মণ্ডপম্'। তখন ৬টা বেজে গিয়েছে। গাড়ীতেই হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। এই মণ্ডপমে এসেই শ্রীরামচন্দ্র সসৈন্য প্রথম আড্ডা করেন। এখান থেকে একটা শাখা লাইন বেরিয়েছে, গিয়েছে কেপ কমোরিণ পর্য্যন্ত। সামান্য কয়েক মাইল পথ। সেখান থেকে ষ্টীমারে পার হলেই লঙ্কা দ্বীপ। সেখানে আর যাওয়া হোলো না। এই কেপ কমোরিণে একটা বাঁধের মত আছে; সাহেবেরা তার নাম রেখেছেন Adam's Bridge। এটা কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের সেতু নয়। রামচন্দ্র যে মণ্ডপে কেন প্রথম ছাউনি করেছিলেন, তা একটু পরেই বুঝতে পারা গেল।

সেতুবন্ধ রামেশ্বর একটা প্রকাণ্ড দ্বীপ। চারিদিকে তার মহাসাগর। মণ্ডপে এসে সেই দ্বীপে যাবার অসুবিধা ছিল; পাঁচ মাইল মহাসাগরের খাড়ী পার হলে তবে ত রামেশ্বর। মণ্ডপ ছেড়ে একটু গিয়েই রেল কোম্পানীর সেতু। সাগরের খাড়ীর উপর পাঁচ মাইল সেতু। দুই দিকে অকূল জলরাশি,—ও-পার দেখা যায় না। অদূরে রামেশ্বর দ্বীপ। এই সেতু পার হয়েও কয়েক মাইল বালুকারাশি! ছোট ছোট গ্রাম, আর নারিকেল কলার বিস্তৃত ক্ষেত্র পার হয়ে আমরা সেই বালুকাময় রামেশ্বর ষ্টেসনে গেলাম। রেলের শেষ এখানেই নয়, আরও ১৪ মাইল গিয়ে

ধনুষ্‌কোটীতে রেল শেষ। সেখানেই pier,—জাহাজ লাগে, মালপত্র নেওয়া হয়।

আমরা রামেশ্বরে নেমে পড়লাম। মহারাজের সেলুন কেটে রেখে গাড়ী ধনুষ্‌কোটী চলে গেল। মহারাজ ইতঃপূর্ব্বেই গাড়ীতে স্নান করে গরদের ধুতি জামা চাদর পরে, খালি পায়ে প্রস্তুত হয়েছিলেন; কুমারদ্বয় ও ভগবতীও তাই। আর সকলেই গাড়ীতেই স্নান সেরে নিয়েছিলেন। আমি কিন্তু তা করি নাই। রামেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে সাগরে স্নান-তর্পণ করে তবে মন্দিরে যাব, এই ছিল আমার সঙ্কল্প। তাই গরদের কাপড়, জামা ও শাল একখানি গামছায় জড়িয়ে নিয়ে নগ্নপদে নেমে পড়লাম।

সকলেই আজ নগ্নপদ। ষ্টেসনে সমস্ত ব্যবস্থা ছিল, মন্দিরের পুরোহিত, কর্ম্মচারী, রামনাদের রাজার ম্যানেজার প্রভৃতি সমস্ত ঠিক করে রেখেছিলেন। দুইখানি মোটর ষ্টেসনে ছিল। ষ্টেসন থেকে মন্দির প্রায় দুই মাইল। আমরা মোটরে মন্দিরের কাছে গেলাম। আমি স্নান তর্পণ করতে গেলাম। মহারাজ মন্দিরের বাইরে দাঁড়িয়ে ফটো তুল্‌তে লাগলেন। একসঙ্গে এসেছি, একসঙ্গে মন্দিরে প্রবেশ করতে হবে; তাই মহারাজ অপেক্ষা করতে লাগলেন। আমি তীর্থ-স্নান ও তর্পণ পাণ্ডাদের সাহায্যে সেরে তাড়াতাড়ি এসে তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

তখন মন্দিরে প্রবেশ। দেখি মহা আয়োজন। সজ্জিত হাতী, উট, ঘোড়া, অনেক বাদ্যকর মহারাজের অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত ছিল। চারিদিকে লোকারণ্য। আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। মন্দির তিন মাইল জুড়ে। কত যে চত্বর, প্রাঙ্গণ, কত যে দেব-দেবী, তার আর সংখ্যা নেই। প্রধান মূর্ত্তি দুইটী—হনুমানের প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি, আর শ্রীরামচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বালির শিবমূর্ত্তি। এ সকলের ইতিহাস যথাসাধ্য পরে বল্‌ছি,
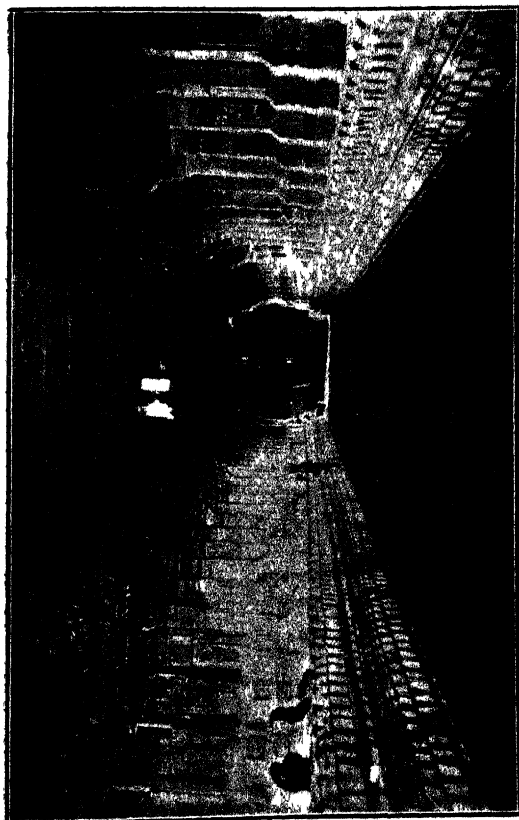
আগে মন্দির দেখে নিই। প্রত্যেক মন্দিরেই মাল্য-গ্রহণ; মহারাজ সর্ব্বত্র উত্তরীয় পেতে লাগলেন। আমরাও মালা পেতে লাগলাম, আর চন্দনের ফোঁটা। মালায় গলা ভরে গেলে সেগুলি চাকরদের হাতে দিয়ে পুনরায় মালা গ্রহণ।

দেবদেবী আর ফুরায় না; অন্ধকার মন্দিরেরও শেষ নেই। চারিদিকে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীর, আর তার মধ্যে অগণ্য মন্দির, গর্ভগৃহ, চত্বর। সবটাতেই আলো জ্বল্‌ছে, প্রদীপ আছে, অনেকগুলি ইলেক্‌ট্রিক আলোও আছে। মন্দিরগুলোর মধ্যের অন্ধকার দূর করবার জন্য সেই দিন দুপুরেও শতশত আলো জ্বালা হয়েছে; তাতেও সে বিশাল অন্ধকার কেটে যায় নাই।

মহারাজ প্রত্যেক মন্দিরে দুইহাতে প্রণামী দিতে লাগলেন। বেলা আটটায় প্রবেশ, আর বহির্গমন সাড়ে দশটায়। মন্দিরের মধ্যে বাজারও আছে। আমি কয়েকখানা ফটো কিনলাম। আমার মনে হোলো, এই মন্দিরের দেব-দেবী, লোকজন, ভৃত্য, কাঙ্গালী, সাধু সন্ন্যাসী, শোভা-যাত্রাকারী প্রভৃতিকে দিতে, এবং রামেশ্বরের ভোগ দিতে মহারাজের প্রায় হাজার দুই তিন টাকার উপর লেগে গেল। আমিও যথাসাধ্য টাকা, আধুলি, সিকি, দুয়ানি যেখানে যেমন পারলাম দান করলাম। কয়েকটী কিশোর এক স্থানে দাঁড়িয়ে মন্দিরা বাজিয়ে তামিল স্তোত্র গান করছিল। কথা বুঝতে পারলাম না, কিন্তু সুর ভারি মিষ্ট এবং বড়ই মনোরম। ছেলে কয়েকটী ব্রাহ্মণ-সন্তান, সৌম্য মূর্ত্তি। মহারাজ প্রত্যেককে একটী করে টাকা দিলেন। আমিও প্রত্যেককে চার আনা হিসাবে দান করে পুণ্য সঞ্চয় করলাম।

মন্দিরের মধ্যে যেমন করে হোক, দু তিন মাইল হাঁটতে হয়েছিল, তবুও দেখা শেষ হয় না। শেষে রণে ভঙ্গ দিয়ে বাইরে এসে হাঁফ ছেড়ে

বাঁচি। বাতাস কিন্তু খুব ঠাণ্ডা, শরীর জুড়িয়ে যায়। পদতলে শুধু বালি।

মনে করেছিলাম, ষ্টেসনে গিয়ে সেলুনে বুঝি যথারীতি আহার হবে তা নয়। রামনাদের রাজার একটী অনতিবৃহৎ ভবন এখানে আছে। সেখানেই খেতে হবে। সেখানে কর্ম্মচারীরা রাজার আদেশে সমস্ত আয়োজন করেছেন। ষ্টেসন থেকে আমাদের লোকজন আনিয়েছেন। তাঁদের লোকেরাও রান্না করছে, আমাদের লোকেরাও রান্না করছে, রামেশ্বর দেবের ভোগও আস্‌বে। সুতরাং আমাদের সেই রাজ-গৃহে যেতে হোলো।

রাজবাড়ীর ভিতরে একটা সুসজ্জিত মহলে মহারাজা আশ্রয় নিলেন। আমরা বাইরের একটা প্রকাণ্ড ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ার আশ্রয় করলাম। গরদের কাপড় জামা একেবারে ভিজে গিয়েছিল, আর ফোঁটা চন্দন ও মালায় চর্চ্চিত হয়েছিল। সেখানেই সকালের স্নানের কাপড়খানি পরে শান্তিলাভ করা গেল। হাত-মুখ ধুয়ে স্থির হলাম, শরীরও স্নিগ্ধ হোলো।

এরই মধ্যে দলে-দলে লোকজন জিনিষপত্র নিয়ে হাজির। মহারাজের বিশ্রাম-কক্ষের বারান্দায় মেলা বসে গেল। তিনি, দুই কুমার, আর ভগবতী যা-তা সব কিন্‌তে লাগলেন। আমরাও বাইরের বারান্দায় মেলা বসালাম। কড়ি, ঝিনুক, শঙ্খ প্রভৃতি আমরাও সামান্য কিনলাম। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা এসে মিছরী প্রভৃতি প্রসাদ দিয়ে গেলেন। তার পর খাতা এলো, নাম ধাম লিখে দিতে হবে। মহারাজ নিজের হাতে ইংরাজী ও হিন্দীতে আত্ম-পরিচয় লিখে দিয়েছেন। আমি বল্‌লাম বাঙ্গালায় লিখব। পাণ্ডা তাতেই স্বীকার হোলো। আমি বাঙ্গালা অক্ষরে নাম, পিতার নাম, পিতামহের নাম, সাত ছেলের নাম, চার ভাইপোয়ের নাম, দুই

পৌত্রের নাম, গ্রামের নাম, জেলার নাম, বাঙ্গালা দেশ, সব লিখে দিলাম। পাণ্ডা আবার তার নীচে তামিল ভাষায় আমার কাছে শুনে-শুনে সব তর্জ্জমা করে লিখে নিলেন। খাতাবদ্ধ হওয়া গেল। যদি কখন আমার

রামেশ্বর মন্দিরের দৃশ্য (দূর হইতে)

বংশের কেউ রামেশ্বরে আসেন, তা হোলে এই পাণ্ডা বা তার উত্তরাধিকারীরা তাঁদের উপর স্বত্ব সাব্যস্ত করবেন এই খাতা দেখিয়ে। এরা সব খাতা মুখস্থ করে রাখে। মনেও ত থাকে! তার পর আহার।

একেবারে প্রকাণ্ড ভোজ—বাঙ্গালা তরকারী, মিষ্টান্ন ও দেশী তরকারী, ভাত, পোলাও, প্রচুর আহার। বেলা যখন একটা বাজল, তখন ষ্টেসনে যাত্রা।

এদিকে কিন্তু আর এক ব্যবস্থা মহারাজা ও ললিত করে রেখেছিলেন। ষ্টেসন থেকে রেলে ধনুষ্কোটী যেতে হবে। কিন্তু পাঁচটার পূর্ব্বে গাড়ী নেই। ললিত অদ্ভুত-কর্ম্মা। সে সকালে নেমেই টাকা-কড়ি দিয়ে ঠিক করেছিল যে, আড়াইটার সময় কুলী নিয়ে যে গাড়ীখানি ধনুষ্কোটী যাবে, তারই সঙ্গে আমাদের সেলুন জুড়ে দিতে হবে। আমরা ষ্টেসনে এসে দেখি সব ঠিক। একটু বিশ্রাম করবার পরই সেই কুলী-বোঝাই মাল-গাড়ীর সঙ্গে আমাদের সেলুন জুড়ে দিল। চোদ্দ মাইল গিয়ে ধনুষ্কোটী পৌঁছিলাম। এ চোদ্দ মাইল সুধু বালিয়াড়ি; গ্রাম একেবারে নেই, গাছপালাও নেই,—চারিদিকে অনন্ত বালুকারাশি—আর দূরে ভারত-মহাসাগরের গর্জ্জন!

ধনুষ্কোটীতে মন্দির নেই; তবে সেই বালুকারাশির মধ্যেই ষ্টেসন নির্ম্মিত হয়েছে, কতকগুলি বাড়ীও তৈরী হয়েছে; এমন কি একটা খৃষ্টানী গির্জ্জা নির্ম্মাণ করতেও ভুল হয় নাই। এখানেই রেল শেষ। পাশে একটা শাখা-পথ; তা দিয়ে একটু দূরে গেলেই Pier। ষ্টেসন থেকে সমুদ্রের জল পোয়া মাইল দূরে, Pierও তাই। অন্য যান নেই, সুধু গরুর গাড়া। এ পোয়া মাইল সেই তিনটার সময় রৌদ্রের মধ্যে যাওয়া অসম্ভব; বালিতে পা বসে যায়; আর গরমও তেমনি, যদিও গায়ে বেশ ঠাণ্ডা সমুদ্রের হাওয়া লাগছে। মহারাজ বললেন, সবাইকে সমুদ্রে নাইতে হবে। তখন সবাই সেই যানে চড়ে একেবারে মহাসাগরের কিনারায় যাওয়া গেল। মহারাজদের সঙ্গে নাইবার পোষাক ছিল, তাঁরা কাপড় ছেড়ে সেই পোষাক পরে মহাসাগরে নেমে পড়লেন। আমরাও

কাপড় আর গামছা কোমরে বেঁধে সাগরে নামলাম। ললিতটা যেন অসুর বিক্রমে ঢেউ নিতে লাগল। ধিরাজকুমার, ভগবতী, রামেশ্বর, এমন কি ছোট কুমার পর্য্যন্ত ঢেউ খেয়ে আনন্দ

রামেশ্বর মন্দিরের গোপুরম
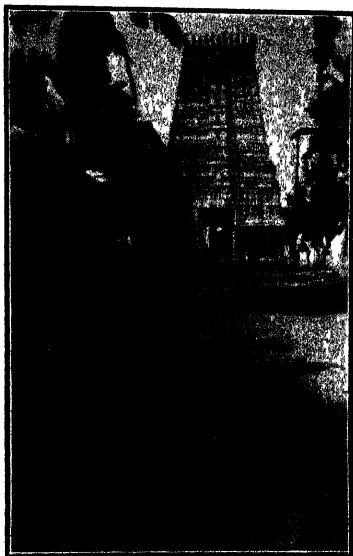
করতে লাগলেন। উচ্চ চীৎকার ও আনন্দধ্বনিতে ভারত মহাসাগরের তীরভূমি মুখর হয়ে উঠল। আমরা দুটী নাবালক—নটরাজ আর আমি, নিরাপদ স্থানে থেকে অল্প কয়েকটা ঢেউ খেয়ে বালিতে

গড়াগড়ি দিয়ে নাকে মুখে মাথায় গায়ে বালি মেখে, ছুই চার ঢোঁক নোনা জলও খেয়ে, কোন রকমে উপরে উঠলাম। আর সবাই আধ ঘণ্টার উপর ঢেউয়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে লাগলেন। কারও কোন সঙ্কোচ নেই, মহারাজও বালক বনে গেলেন। হো হো হাসি সমুদ্র-গর্জ্জনের সঙ্গে পাল্লা দিতে লাগল।

যুবকদলের সে যে কি উল্লাস, তার বর্ণনা আমি বৃদ্ধ কেমন করে দেব। তার পর সবাই কাপড় ছাড়লেন। বালি ছাড়াতে প্রাণান্ত, এদিকে বাতাসও খুব। আমি বালির উপর ফেলে দিয়ে পাঁচ মিনিটেই কাপড় গামছা শুকিয়ে নিলাম। তার পর গোযানে উঠে মহারাজের আদেশ হোলো মহাসাগরের ধার দিয়ে Pier পর্য্যন্ত যেতে হবে। তাই যাওয়া গেল। সেখানে প্রকাণ্ড জেঠী। তারই উপর দিয়ে মাল-গাড়ী নিয়ে একেবারে জাহাজের মধ্যে গাড়ীর মাল ঢেলে দেওয়া হচ্চে। ছুখানি জাহাজ ছিল; কোথায় যাচ্ছে জানিনে, জিজ্ঞাসাও করিনি।

সাড়ে পাঁচটার সময় ষ্টেসনে এলাম। দেখি পাঁচটার গাড়ী এসে গেছে। ছটার সময় আমাদের গাড়ী ছাড়বে। আমি একটা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় একেলা বসে মহাসমুদ্রের শোভা, আর সূর্য্যাস্তের আয়োজন দেখতে লাগলাম। দেখলামই, কিন্তু তা বর্ণনা করবার শক্তি আমার নেই;– আমার সুধু মনে হোলো—'ঐ যে দেখা যায় আনন্দধাম ভব-জলধির পারে জ্যোতির্ম্ময়!'

ছটার একটু আগেই গাড়ী প্রস্তুত হোলো। সেলুন জুড়ে দেওয়া হোলো। ধনুষ্কোটী থেকে ৬টায় গাড়ী ছাড়ল। এই গাড়ীই বরাবর চলে যাবে। আমরা রাত্রি এগারটা পঁচিশ মিনিটে মাত্রায় পৌঁছিব। সেখানে গাড়ী ছেড়ে দিতে হবে। মহারাজের সেলুন কেটে রাখবে।

ধনুষ্কোটী থেকে গাড়ী রামেশ্বরে এলো। আমরা আর একবার
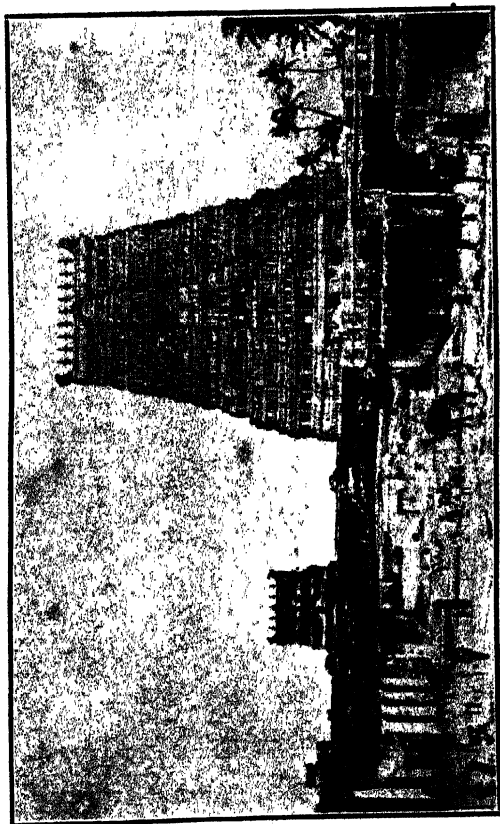
রামেশ্বর পূর্ব্ব-গোপুরম্—(সাধারণ দৃশ্য)

তীর্থশ্রেষ্ঠ রামেশ্বর দর্শন করে নিলাম। এ জীবনে আর হয়ত এখানে আসা হবে না।

এইখানে রামেশ্বরম্ সম্বন্ধে দুই-চারিটী কথা বলি। এই রামেশ্বরম্ একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ। শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কা-বিজয়ে গমন করেন, তখন এ দ্বীপের অস্তিত্ব ছিল না। রামচন্দ্র সৈন্যদল নিয়ে সমুদ্রতীরে যেস্থানে উপস্থিত হন এবং যেখানে ছাউনি ক'রে সেতুবন্ধের আয়োজন করেন, সে স্থানের নাম 'মণ্ডপম্'। এই 'মণ্ডপম্' নামের দ্বারাই সে কথা বেশ বুঝতে পারা যায়। এখন এই মণ্ডপে একটা রেল ষ্টেসন স্থাপিত হয়েছে এবং এখান থেকে একটা শাখা লাইন অপর দিকে সমুদ্রতীরে চলে গিয়েছে। সেখান থেকে ষ্টীমারে পার হলেই সিংহল দ্বীপ।

রামচন্দ্র যখন সেতু বন্ধন করে লঙ্কা-দ্বীপে যান, তখন যদি রামেশ্বরের অস্তিত্ব না থাকে, তা হোলে এ স্থলের উৎপত্তি হোলো কি করে? তারও সমাধান আছে। যাঁরা রামায়ণ পড়েছেন, তাঁরা জানেন, লঙ্কা-সমরে লক্ষ্মণ শক্তিশেলে আহত হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। কিছুতেই যখন তাঁর চেতনা-সঞ্চার হোলো না, তখন বৈদ্যরাজ সুষেণ বল্লেন যে, গন্ধমাদন পর্ব্বতে বিশল্যকরণী নামে যে লতা আছে, সেই লতার রস ঠাকুর লক্ষ্মণের নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করিয়ে দিলে তবে লক্ষ্মণের জ্ঞান সঞ্চার হবে, তা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই কথা শুনে হনুমান বললেন "সে আর বেশী কথা কি, আমি গন্ধমাদন পর্ব্বতে গিয়ে বিশল্যকরণী এই রাতের মধ্যেই এনে দিচ্ছি।" এই ব'লে হনুমান গেলেন বিশল্যকরণী আন্‌তে। সেখানে গিয়ে রাতের অন্ধকারেই হোক, আর লতা চিন্‌তে না পেরেই হোক হনুমান মহা বিভ্রাটে পড়ে গেলেন। বিলম্ব করবার যো নেই, রাত্রের মধ্যেই বিশল্যকরণী নিয়ে যাওয়া চাই-ই, রাত কেটে গেলে বিশল্যকরণীতেও কিছু হবে না। তখন

হনুমান আর কোন উপায় না দেখে একেবারে গন্ধমাদন পর্ব্বতটাকেই উপড়ে নিয়ে মাথায় করে লঙ্কায় হাজির। বৈদ্য সুষেণ পর্ব্বত খুঁজে বিশল্যকরণী বার করলেন ; ঠাকুর লক্ষ্মণের প্রাণ-রক্ষা হোলো।

এখন এত বড় পর্ব্বতটাকে নিয়ে কি করা যায় ? লঙ্কায় ফেলে রাখা ত সঙ্গত হবে না। হনুমান তখন পুনরায় পর্ব্বতটাকে স্কন্ধে করে যথাস্থানে রেখে আস্‌বার কষ্ট স্বীকার না করে, তাকে আকাশে তুলে ছুঁড়ে মারলেন। তাঁর অভিপ্রায় ছিল যে, তিনি যতটা বেগে পর্ব্বতটাকে নিক্ষেপ করেছেন, তাতে সে যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। কিন্তু তা হোলো না, গন্ধমাদন নিজ স্থান পর্য্যন্ত গিয়ে উঠতে পারলেন না, সমুদ্রতীরে মণ্ডপম্ সহরের অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে পড়লেন। পর্ব্বত ত নিতান্ত ছোট নয়, আর সেখানে সমুদ্রের জলও খুব গভীর ছিল না ; তাই পর্ব্বতটা ডুবে গেল না, খানিকটা অংশ জেগে রইল, অর্থাৎ একটা দ্বীপরূপে পরিণত হোলো। এই দ্বীপেরই পরে নাম হোলো রামেশ্বরম্। এ কিন্তু আমার মন-গড়া প্রত্নতত্ত্ব নয়—খাঁটি পুরাণের কথা—অবিশ্বাস করবার যো নাই।

যাক্, লঙ্কা জয় হোলো, রাবণ সবংশে নিহত হোলেন, সীতা দেবীর উদ্ধার সাধিত হোলো। রামচন্দ্র তার পর সসৈন্য সেতুর উপর দিয়ে এ-পারে এলেন। যেখানে প্রথম এলেন, সেস্থান ঐ গন্ধমাদন প্রতিষ্ঠিত দ্বীপ। সেই সময় ঐ অঞ্চলের অধিবাসীরা এসে নিবেদন করল যে, সেতুটী যদি থাকে, তা হলে লঙ্কার রাক্ষসেরা অনায়াসে সমুদ্র পার হয়ে এসে এ প্রদেশের অধিবাসীদিগের উপর ঘোর অত্যাচার করবে ; তাদের এখানে বাস করা অসম্ভব হয়ে উঠ্‌বে। এদিকে সমুদ্রও এসে করযোড়ে রামচন্দ্রের কাছে নিবেদন করলেন যে, প্রভুর ত কার্য্য উদ্ধার হোলো, এখন তাহার এ বন্ধনদশা আর থাকে কেন ? এই উভয় আবেদনই অতি সঙ্গত মনে ক'রে দয়াময় রামচন্দ্র ধনুকে বাণ যোজনা করে একই বাণে সমস্ত সেতুটী

রামেশ্বর মহাদেব কুণ্ড
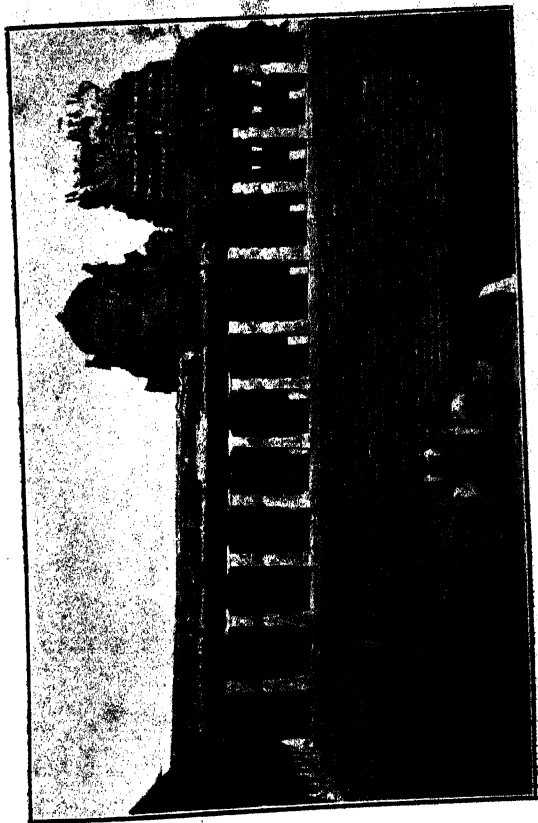
উড়িয়ে দিলেন, তার চিহ্নমাত্রও থাকল না। তারই জন্য ঐ স্থানের নাম হোলো ধনুষ্কোটী এবং সেই নামই এখনও আছে।

তার পর শ্রীরামচন্দ্র যেখানে এলেন, সেটীও গন্ধমাদন পর্ব্বত হইতে নির্ম্মিত দ্বীপের আর এক অংশ। এই স্থানে আসবার পর মুনিঋষিরা সকলে সমাগত হয়ে শ্রীরামচন্দ্রকে বল্লেন যে, রাবণকে বিনাশ করায় তাঁহার ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়েছে; কারণ রাবণের রাক্ষসীর গর্ভে জন্ম হ'লেও তিনি ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেছেন; সুতরাং রাবণবধে তাঁর ব্রহ্মহত্যা করা হয়েছে। তখন সকল ঋষি মিলে ব্যবস্থা করলেন যে, এই স্থানে রামচন্দ্র কোন শুভ লগ্নে লিঙ্গমূর্ত্তি যথারীতি প্রতিষ্ঠিত করলে তাঁর পাতক দূর হবে। শ্রীরামচন্দ্র তাতেই সম্মত হলেন। শুভদিন স্থির হোলো। লিঙ্গমূর্ত্তি ত যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না, নর্ম্মদা নদীতেই মাত্র পাওয়া যায়; এবং সেও অনেক অনুসন্ধান করলে মেলে। চলিলেন বীর হনুমান সেই ভারতের দক্ষিণ-প্রান্তস্থ সমুদ্রতীর হতে নর্ম্মদায় লিঙ্গমূর্ত্তি আনবার জন্য।

এদিকে অন্য সব আয়োজন হতে লাগল। শুভদিন সমাগত হোলো, কিন্তু কোথায় হনুমান! তাঁর সাড়া-শব্দও নাই, কোন সংবাদই নাই। সকলেই চিন্তিত হলেন। যখন সমস্ত আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে, দেবগণের সমাবেশ হয়েছে, তখন এমন শুভ লগ্ন ত ব্যর্থ হতে দিতে পারা যায় না। তখন পরামর্শ করে স্থির হোলো যে, সেই শুভ মুহূর্ত্তে বালুকা নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করা হোক। তাহাই হোলো। মূর্ত্তির নাম দেওয়া হোলো রামলিঙ্গ বা রামনাথ এবং স্থানের নামকরণ হোলো রামেশ্বরম্।

যেদিন এই মূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা কার্য্য শেষ হোলো, তার পরদিনই হনুমান মূর্ত্তি নিয়ে হাজির হলেন এবং কৈফিয়ৎ দিলেন যে, এই মূর্ত্তির অনুসন্ধানে তাঁকে যথেষ্ট প্রয়াস স্বীকার করতে হয়েছে; তাই তিনি যথাসময়ে উপস্থিত

হতে পারেন নাই। তার পর তিনি যখন শুন্‌লেন যে, তাঁর জন্ত অপেক্ষা না করে, শুভলগ্ন অতীত হয় দেখে শ্রীরামচন্দ্র বালুকা-নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি যথারীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন, তখন হনুমান একেবারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হুতাশনবৎ হলেন। তিনি বল্‌লেন, সে হতেই পারে না, দূর করে দেও, ভেঙ্গে ফেলে দেও তোমার বালির মূর্ত্তি! আমার এই মূর্ত্তিই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শ্রীরামচন্দ্র ও অন্যান্য সকলে হনুমানকে শান্ত করতে চেষ্টা করলেন; তিনি যে কথা বল্‌ছেন, তা যে শাস্ত্র-সঙ্গত নয়, তাহাও বুঝাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু, হনুমান কোন যুক্তিই শুন্‌তে প্রস্তুত নন; তিনি এত কষ্ট করে এতদূর থেকে মূর্ত্তি আন্‌লেন, আর তার প্রতিষ্ঠা না হয়ে বালির মূর্ত্তি থাক্‌বে—এ কিছুতেই হবে না। তিনি তখন জোর করে শ্রীরামচন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত বালুকা-নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি ভেঙ্গে ফেল্‌তে গেলেন; কিন্তু, সে মূর্ত্তি তখন পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। অত-বড় বীরের চেষ্টা ব্যর্থ হোলো, মূর্ত্তি অপসারিত করা দূরে থাক, একটু ভাঙ্গতেও তিনি পারলেন না। তবে, তিনি যখন সেই মূর্ত্তি ভাঙ্গবার জন্য চেষ্টা করেন, তখন তাঁর অঙ্গুলির চিহ্ন মূর্ত্তির উপর অঙ্কিত হয়েছিল। রামেশ্বরের পাণ্ডারা এখনও যাত্রীদিগকে তাহা দেখাইয়া থাকে। সকল যাত্রী না কি সে বালির লিঙ্গমূর্ত্তির দর্শন পায় না, তাহা সোনার একটী আবরণে আবৃত থাকে। সাধারণ যাত্রীরা তাই দেখে কৃতার্থ হয়। আর যাঁহারা অসাধারণ যাত্রী অর্থাৎ যাঁহারা বেশী রকম ভেট ও দক্ষিণা কবুল করেন, পাণ্ডারা স্বর্ণাবরণ উন্মোচন করে তাঁদের আসল বালুকা-নির্ম্মিত মূর্ত্তি দেখিয়ে থাকেন। আমরা অসাধারণ দলের যাত্রীই ছিলাম এবং যথাতিরিক্ত দক্ষিণা প্রাপ্তির আশাও পাণ্ডাদের বিলক্ষণ ছিল, তাই আমরা বালুকা নির্ম্মিত মূর্ত্তিই দেখ্‌তে পেয়েছিলাম; কিন্তু যে অন্ধকার ঘর, প্রায় হাজার-খানেক প্রদীপ জ্বেলেও যে অন্ধকার দূর করা যায় না, সেখানে বীর হনুমানের অঙ্গুলির টিপ আমি

শ্রীরামলিঙ্গ সেতুপতি—রামনাদের মহারাজা

ঠাহর করতে পারিনি ; তবে আর যাঁরা দেখ্‌তে পেয়েছেন, তাঁদের কথা এবং পুরাণ-বাক্য মেনে নিতে আমার কোনই আপত্তি নাই।

যাক্, সে কথা। মহাবীর হনুমান যখন বালুকা-নির্ম্মিত লিঙ্গমূর্ত্তি ভাঙ্গতে বা সরাতেও অকৃতকার্য্য হলেন, তখন দয়াময় শ্রীরামচন্দ্র সহাস্য বদনে বল্‌লেন "ভক্তবীর, তুমি মনে ক্ষোভ কোরো না। তোমার আনীত মূর্ত্তিও আর একটা শুভ দিন দেখে ঐ মূর্ত্তির অনতিদূরে যথারীতি অনুষ্ঠান সহকারে স্থাপিত হবে। এবং আমার আদেশ এই যে, এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত দুইটী মূর্ত্তির মধ্যে তোমাব স্থাপিত মূর্ত্তির নাম হবে হনুমান-লিঙ্গ এবং তোমার এই মূর্ত্তিব পূজা সর্ব্বাগ্রে হবে, তার পর আমার স্থাপিত মূর্ত্তির পূজা হবে।" এই ব্যবস্থায় হনুমান সন্তুষ্ট হলেন। সেই থেকে ঐ ব্যবস্থাই চলে আস্‌ছে। হনুমান-লিঙ্গের পূজা আগে হয়, রামলিঙ্গের পূজা পরে হয়। ভক্তের কাছে ভগবানকে এমন করেই পরাজয় স্বীকার করতে হয়!

এ ত গেল ত্রেতাযুগে লিঙ্গমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠাব কথা। তার পর কেমন করে এই সব প্রকাণ্ডকায় মন্দিব গড়ে উঠ্‌ল, তার ব্যবস্থা বন্দোবস্তই বা কি করে, কার দ্বারা হোলো, তার ইতিহাস আছে। এতক্ষণ যা বল্‌লাম, তা পুরাণ কথা ; এখন যা বল্‌ব তা ইতিহাস।

রামনাদের রাজবংশ সেতুপতি নামে অভিহিত হয়ে থাকেন। এই বংশ বহুকাল থেকে রামেশ্বরমের মন্দিরাদির পূজার ব্যবস্থা করে আস্‌ছেন। তাঁদের অনেকেব কীর্ত্তি-কাহিনী এই সকল মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ রয়েছে। এই বংশের একজন রাজার নাম ছিল রঘুনাথ সেতুপতি। তিনি ১৬৬৯ অব্দে তাঞ্জোরের সৈন্যদলকে যুদ্ধে পরাস্ত করে অনেক স্থান স্বাধিকারভুক্ত করেন। আর একটী শিলালিপি পাঠে জান্‌তে পারা যায়, মহাপরাক্রমশালী তিরুমালাই সেতুপতি, যখন মহিষুরের রাজা মাদুরা আক্রমণ করেন, তখন মাদুরার রাজাকে সাহায্য করেন এবং এই জন্য

মাদুরার রাজা তাঁহাকে অনেকগুলি জনপদ দান করেন। মন্দিরের বিভিন্ন স্থানে স্তম্ভগাত্রে যে সকল তাম্রলিপি আছে, তাহা হইতেও জানতে পারা যায় যে, এই সেতুপতি-বংশের অনেক রাজা মন্দিরের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ অনেক অর্থ ও গ্রাম দান করেছিলেন। শ্রীতিরুমালাই রঘুনাথ সেতুপতি ১৬৫৯ অব্দে এই রামেশ্বরমের সন্নিহিত ধনুষকোটীতে হিরণ্যগর্ভদান কার্য্য সম্পন্ন করেন এবং তদুপলক্ষে বহু অর্থ ও মণিমুক্তা এবং সুবর্ণ-নির্ম্মিত নানা আস্‌বাব রামেশ্বরমের মন্দিরে দান করেন। রামেশ্বরমের প্রধান মন্দির কয়েকটী উদয়ন সেতুপতি কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। এই মন্দিরাদি নির্ম্মাণে তিনি সিংহল দ্বীপের বাজা পাররাজ শেখরের নিকট অনেক সাহায্য প্রাপ্ত হন। যতদূর জানতে পারা যায়, তাহাতে ১৪১৪ অব্দে রামেশ্বরমের প্রধান মন্দির কয়েকটি নির্ম্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

রামেশ্বরের উত্তর ও দক্ষিণ গোপুরম্ কিরণ রায়ার কর্ত্তৃক ১৪২০ অব্দে নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, কিন্তু, কি কারণে বলা যায় না, গোপুরম্ দুইটীর নির্ম্মাণ সমাপ্ত হয় নাই; যতটুকু হয়েছিল সেই অবস্থায়ই এখন পর্য্যন্ত রয়েছে। উদয়ন সেতুপতি পশ্চিম দিকের গোপুরম্ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। মাদুরার একজন ধনী হিন্দু মন্দিরের মধ্যস্থ অট্টালিকাগুলির সংস্কার সাধন করেন এবং অনেকগুলি নূতন গৃহও নির্ম্মাণ করেন। রামেশ্বরের মন্দিরগুলি তিনটী প্রাকার দ্বারা বেষ্টিত। দক্ষিণ দিকের দ্বিতীয় প্রাকার তিরুমালাই সেতুপতি ১৫৪০ অব্দে নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। পূর্ব্বদিকের গোপুরম্ও সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয় নাই। মন্দিরের তৃতীয় প্রাকার ১৬৬২ অব্দে নির্ম্মিত হয়। এই সকল বিবরণ থেকে জানতে পারা যায় যে, রামেশ্বরমের মন্দির একই সময়ে একজন সেতুপতির দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হতে প্রায় সাড়ে তিনশত বৎসর লেগেছিল। অন্যান্য স্থানের ধনী লোকে মন্দির নির্ম্মাণে

ধনুষ্কোটী (১)

াহায্য করলেও, এ কথা বলা যেতে পারে যে, রামনাদের সেতুপতি াজগণই রামেশ্বরমের মন্দিরাদি নির্ম্মাণে যথেষ্ট অর্থব্যয় করেছেন; এবং এখনও যে পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা ও নিয়ম অনুসারে মন্দিরের পূজা ও সেবা-কার্য্য সুসম্পন্ন হচ্চে, তার জন্য রামনাদের সেতুপতি বংশের রাজগণই কৃতজ্ঞতাভাজন।

রামেশ্বরের মন্দিরাদিতে কি ভাবে পূজার্চ্চনা হয় এবং বিশেষ-বিশেষ পর্ব্বোপলক্ষে কি কি অনুষ্ঠান হয়, তার বিবরণ দিতে গেলে এক প্রকাণ্ড ইতিহাস রচনা করতে হয়। এই বল্‌লেই যথেষ্ট হবে যে, এই মন্দিরের পূজার জন্য পুরোহিত হইতে আরম্ভ করে সামান্য ভৃত্য পর্য্যন্ত যথারীতি নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করে থাকেন। ভোগের জন্য প্রতিদিন ১৮০ পালি চাউলের বরাদ্দ আছে; তা ছাড়া অন্যান্য উপকরণ আছে। যাত্রীরা এখানে কিছু দক্ষিণা দিলেই প্রসাদ পেতে পাবেন। এখানে যাত্রীদিগের অবস্থানের জন্য অনেক পান্থ-নিবাস আছে, বাজার-হাটও আছে; জিনিষপত্রও সব রকম পাওয়া যায়। আমার এই কথা শুনে কেহ যদি ব'লে বসেন 'মশাই, সেখানে ভীমনাগের সন্দেশ পাওয়া যায়?' তা হলে আমাকে আমার 'সব পাওয়া যায়' কথাটা ফিরিয়ে নিতে হবে। আমার বল্‌বার অর্থ এই যে, তীর্থ-যাত্রীদের যা যা প্রয়োজন হতে পারে, সে সবই পাওয়া যায়; বিলাসী বাবু-লোকের কথা বলি নাই। তবে, এ-কথাও বল্‌ছি, এই রামেশ্বরমেও সিগারেট মেলে;—এ জিনিষটা দেখ্‌ছি সর্ব্বব্যাপী হয়েছে।

আর একটী কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। আমাদের দেশে যেমন আরতির সময় ধূপধূনা জ্বালান হয়, এ দেশে কিন্তু তা দেখলাম না। শুধু রামেশ্বরে নয়, দক্ষিণাপথের সমস্ত মন্দিরেই কর্পূর জ্বালানো হয়, এবং যাত্রীদিগকে যখন চরণামৃত দেওয়া হয়, তখন একটু কর্পূরও

দেওয়া হয়। ধনী যাত্রীরা এতদ্ব্যতীত মালা চন্দন, নারিকেল, উত্তরীয় প্রভৃতিও পেয়ে থাকেন; তবে সে সকল প্রাপ্তি দক্ষিণার পরিমাণের উপর নির্ভর করে। আমরা রামেশ্বরে যেমন অতিরিক্ত দক্ষিণা দিয়েছিলাম, আমাদের আদর অভ্যর্থনাও তেমনি বিরাট হয়েছিল, প্রাপ্তিও বড় কম হয় নাই—রাজবাড়ীর মহাভোজটা ফাউ!

এখন আবার আমাদের ভ্রমণ-কথা বলি। আমাদের গাড়ী যখন রামেশ্বরম্ ছাড়ল, তখনও সন্ধ্যা হয় নাই। আমরা সমুদ্রের শোভা এবং সমুদ্রে সূর্য্যাস্তের মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে তীর্থশ্রেষ্ঠ রামেশ্বরকে পিছনে ফেললাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার হোয়ে এল। গাড়ী সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুট্‌ছে। আমরা রামেশ্বরের কথা আলোচনা করতে লাগলাম। বিছানা পেতে শয়ন করবার সুবিধা হবে না, কারণ রাত্রি ১১টা ২৫ মিনিটের সময় আমাদের মাদুরা ষ্টেসনে নামতে হবে। মধ্যে একটা ষ্টেসনে নেমে আমরা সেলুনে গিয়ে আহার শেষ করে এলাম। তার পর রাত সাড়ে এগারটা পর্য্যন্ত জেগেই থাক্‌লাম।

মাদুরায় গাড়ী পৌঁছিলে আমরা নেমে পড়লাম। রাত্রিটা আমরা ষ্টেসনের বিশ্রাম-গৃহে বিছানা পেতে শুয়ে থাকব, এই ব্যবস্থা ছিল। সেখানে গিয়ে দেখি, স্থান নেই, যে ক'খানা চেয়ার, ইজি চেয়ার, শুইবার খাট ছিল, সব সাহেব ও দেশী প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীতে বোঝাই।

এখন কোথায় যাই। ষ্টেসনটী দোতালা। উপরেও ঘর আছে। তাতে জনপ্রতি ২৷৷৹ টাকা দিলে ২৪ ঘণ্টা থাকা যায়। সে ঘরগুলিতে আস্‌বাব-পত্রও আছে। সেখানেই অবশিষ্ট রাত্রিটুকু কাটাবো ঠিক করে রামেশ্বরকে দেখ্‌তে ও জান্‌তে পাঠানো গেল। সে দেখে এল সেখানেও একটু স্থান নেই, সব যাত্রীতে বোঝাই।

আমরা তখন মহা বিপদে পড়লাম। ললিত সেলুনে ছিল,

ধনুষ্কোটী (২)
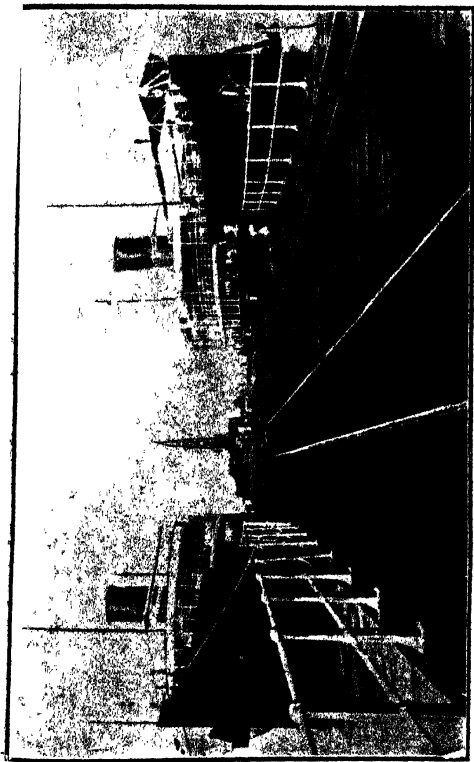
সে ঘুমায় নাই। আমাদেব ব্যবস্থা কবাব জন্য সেই বাত বাবটায় সে এল। বামেশ্বব তখন ডাক-বাংলায় গিয়েছে, যদি সেখানে আশ্রয় মেলে। সেখানেও স্থান নেই ষ্টেসনেব প্রকাণ্ড ছাদে দুখানি ইজিচেযাব টেনে নিয়ে বামেশ্বব আমাদেব বাত্রিবাসেব ব্যবস্থা কবল। আমাদেব সঙ্গী ডাক্তাব কিন্তু নীচেব সেই বিশ্রাম কক্ষেব মেঝেতেই বিছানা পেতে শুয়ে পড়েছিল।

ললিত ইতিমধ্যে ষ্টেসন-মাষ্টাবকে বলে উপবেব যেটা বৈঠকখানা অর্থাৎ Drawing room সেইটী খুলিয়ে নিল। আমাদেব ভাড়া দিতে হবে না। সেখানে কিন্তু খাট বিছানা নেই। আমবা সেই ঘরেব মধ্যে না শুয়ে তাবই বাবান্দায বিছানা পেতে শযন কবলাম। বাতাস ছিল, কিন্তু কি মশাব উপদ্রব! সঙ্গে ত আব মশাবী নিয়ে যাইনি। বাত্রে আব ঘুম হোলো না। বামেশ্বব ছাতে ঘুবেই বাত কাটিয়ে দিল। আমি শুই, উঠি, আব বসি, আব মশা তাডাই। এমনই কবে কোন বকমে বাত কেটে গেল, আমবাও মশকেব হাত হ'তে অব্যাহতি লাভ কবলাম।

মাদুরা

১লা অক্টোবর, ১৫ই আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—

সাড়ে-ছ'টা বাজতে-না-বাজতেই ললিত এসে উপস্থিত। আমি প্ল্যাটফরমের কলে মুখ ধুয়ে নিলাম। অনিদ্রার জন্য কষ্ট বোধ হ'তে লাগল। তার পর রেলের আড্ডায় গিয়ে চা খেয়ে নেওয়া গেল।

সাতটার সময়ই মাদুরার প্রসিদ্ধ মন্দির সমস্ত দেখতে যেতে হবে। ছয়খানা মোটর প্রস্তুত। পুলিশের তিন চার জন ইনস্পেক্টর হাজির। এ সব পূর্ব্বেই ঠিক ছিল। আর এসেছিলেন মাদুরার বিখ্যাত ধনী রাও বাহাদুর নারায়ণ আয়ার মহাশয়। ইনি মহারাজের পরিচিত; বয়স ৭০ বৎসর। সেকেলে ভাল মানুষ, বেশ সাদাসিধে, ইংরাজী বেশ জানেন। ইনিই এখানকার সমস্ত ব্যবস্থা স্থির করে রেখেছিলেন। মন্দিরাদি দেখবারও ব্যবস্থা ইনিই করেছিলেন।

প্রথমেই আমরা প্রধান মন্দির দেখতে গেলাম। মন্দির ত নয়, একটা গ্রাম; চারিদিকে উন্নত প্রাচীর-বেষ্টিত। তার মধ্যে যে কত মণ্ডপ, কত প্রাকার, তা ব'লে উঠা যায় না। হাতী, ঘোড়া, উট, বাজনাওয়ালা, পাণ্ডা, পুরোহিত,—লোকে লোকারণ্য। প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা করে মহারাজকে মন্দির-দ্বার থেকে ভিতরে নিয়ে যাওয়া হোলো। এক-একটা নাটমন্দির এত প্রকাণ্ড যে, এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত নজর চলে না। মধ্যে মধ্যে উন্নত-শির মন্দির। একটা মন্দিরের (এইটা মীনাক্ষি মন্দির) চূড়া স্বর্ণমণ্ডিত। কত

মাদুরা পূর্ব্ব-গোপুরম্
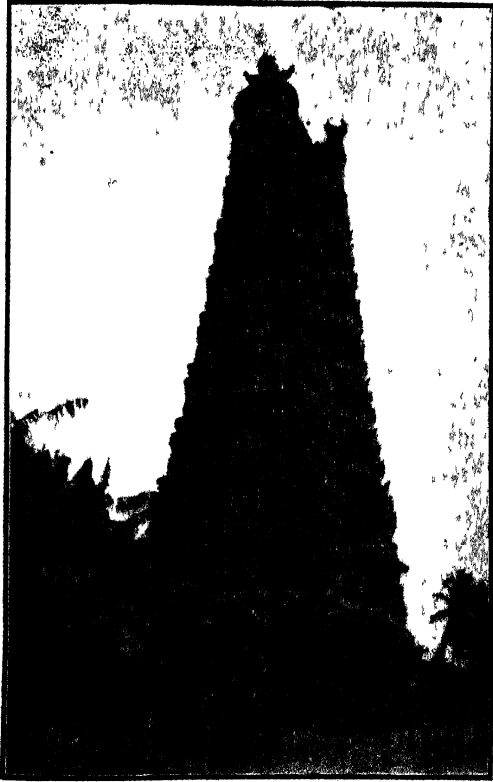
র যে দেখলাম, কত চিত্র-বিচিত্র মূর্ত্তি, দেওয়ালে কত অঙ্কিত মূর্ত্তি, চিত্র! মন্দিরগুলি সবই পাথরে তৈরী। মাদুরাকে সাহেবরা thens of India' 'ভারতের এথেন্স' বলে থাকেন। যেমন বড় র, তেমনই বড়-বড় মন্দির। সব মন্দিরে সেই ফুলের মালা, সেই গামৃত, সেই চন্দন, সেই কর্পূরের আরতি, আর সেই প্রণামী। ত্যেক মন্দিরের কারুকার্য্য হাঁ করে দেখতে হয়। মনে হোলো, এক-কটা মন্দির দেখতেই এক দিন কেটে যায়, এত সুন্দর কারুকার্য্য! মন্দিরই সমান অন্ধকার। রামেশ্বরের মন্দিরগুলির মধ্যে স্থানে স্থানে কটু-আধটুকু সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ-পথ পেয়েছিল; এখানে কিন্তু তাও নেই, ই প্রদীপের আলো। মন্দির-প্রাঙ্গণ, কি নাট-মন্দির সব স্থানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা আছে দেখলাম, কিন্তু দিন বলে হয় ত জ্বলে নাই। ব প্রদীপ, কিন্তু, তাতে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে। কত সিঁড়ি, ত দুয়ারের চৌকাট (পাথরের) পার হতে হোলো। মশালচীরা মশাল ধরে-ধরে' সেই অন্ধকার পথ দেখাতে লাগল। মীনাক্ষির মন্দিরটাই বড়। সখানে পূজা দেওয়া হোলো। লাল গরদের শিরবস্ত্র যে মহারাজ ও কুমারদ্বয় কত পেলেন, তার সংখ্যা নাই।

এই মীনাক্ষি মন্দিরে একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমাদের দেশে, শুধু আমাদের দেশেই কেন, ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই দশকর্ম্ম ও পূজা-অর্চ্চনার জন্য যে সকল পুরোহিত নিযুক্ত থাকেন, তাঁদের অনেকেই লেখাপড়া ভাল জানেন না, কোন রকমে যজমান ভুলিয়ে কাজ করেন, আর যা-তা অশুদ্ধ শ্লোক উচ্চারণ করে স্ত্রীলোক ভুলিয়ে থাকেন। এই মীনাক্ষি মন্দিরেও তাই দেখ্‌লাম। শ্রীযুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যখন দেবীর অঞ্জলি দেবার জন্য পুষ্পাঞ্জলি উপকরণ ও দক্ষিণা-হস্তে দণ্ডায়মান হলেন, তখন যে পুরোহিত মন্ত্র ও স্তোত্র পাঠ করছিল, তার

সব কথাই অশুদ্ধ হচ্ছিল। মহারাজ আর চুপ করে থাকতে না পেবে বললেন, তুমি চুপ কর, আমি মন্ত্র পাঠ করছি। এই বলে তিনি যথারীতি মন্ত্র পাঠ করলেন এবং উদাত্ত স্বরে স্তোত্র পাঠ করতে লাগলেন। দূর থেকে প্রধান পুরোহিত মহাশয় এই ব্যাপার দেখে দৌড়ে এসে মহারাজাব স্তোত্র পাঠের সঙ্গে যোগদান করলেন। এ লোকটা পণ্ডিত। যাক্, এতে কিন্তু পুরোহিত ও পাণ্ডাদের প্রাপ্তিব ব্যাঘাত হয় নাই। বাইবে এসে মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন "এরা এমনি কবেই যাত্রী ভুলিয়ে খায়।"

মন্দির দেখা শেষ হোলো প্রায় সাড়ে দুশটায়। তখন রাও বাহাদুর সকলকে তাঁর বাড়ীতে নিয়ে গেলেন; তাঁর আস্‌বাবপত্র দেখালেন। সে সব খুব সামান্য হোলেও বৃদ্ধের আগ্রহে মহারাজ খুব যত্নের সঙ্গে সমস্ত দেখলেন। পান সুপারী ও নারিকেল দিয়ে রাও বাহাদুর আমাদেব সকলকে অভ্যর্থনা করলেন এবং ঠিক সাড়ে তিনটাব সময় আমাদের নিয়ে আবার বের হবেন বলে বিদায় করলেন।

আমরা ষ্টেসনে এলাম। বিশ্রাম-কক্ষে জল নেই, সেই চারটার পর জল আসবে। এদিকে ভয়ানক গ্রীষ্মে প্রাণ যায়-যায়। মাদুরায় খুব গ্রীষ্ম। তখন রামেশ্বর একটী যুবকের সাহায্যে ষ্টেসনের নিকট একটা ধর্ম্মশালায় স্নানের ব্যবস্থা করে এল। আমি আর রামেশ্বব সেখানে কাপড় গামছা নিয়ে গেলাম। সেই যুবকটীকে পয়সা দিতে সে নারিকেলের তেল, আর এক রকম কি মাটী (বোধ হয় সাজী-মাটী) কিনে এনে দিল। সর্ব্বাঙ্গে নারিকেল তেল মেখে, কলের জলে একবার স্নান করে নিয়ে তার পর সেই মাটী সাবানের মত মাথায় গায়ে মেখে পুনরায় স্নান করা গেল, সব তেল উঠে গেল। শরীরও পরিষ্কার হোলো। বেলা-দ্বিপ্রহরে রৌদ্রে উত্তপ্ত হোয়ে এই যে অনেকক্ষণ
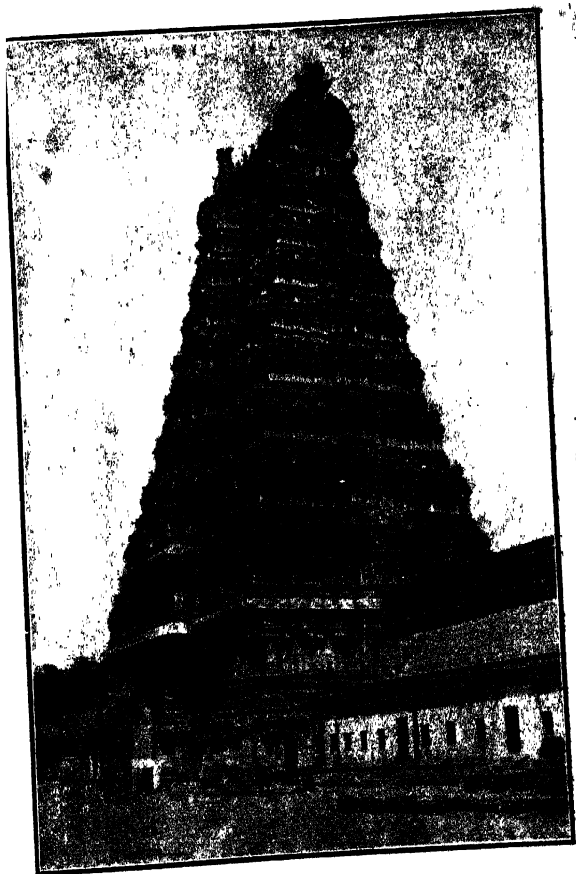
মাদুরা উত্তর গোপুরম

মাদুরা পশ্চিম-গোপুরম্

ধরে স্নান, শরীর যেন জুড়িয়ে গেল। তারপর সেই যুবককে দিয়েই কিছু মিষ্টান্ন এনে সেখানেই জলযোগ করে একটু পরে ষ্টেসনে এলাম। স্বেলুনে গিয়ে কোন রকমে দুইটা আহার করে, সেলুনেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রায় সাড়ে তিনটা পর্য্যন্ত ঘুম। তবে শরীর ঠিক হোলো।

বৃদ্ধ রাও বাহাদুর ঠিক তিনটায় এসে হাজির। কিন্তু এমন প্রখর রৌদ্রে আর বাহির হওয়া গেল না। চারটার পর আবার বাহির হয়ে বাকী কয়েকটী মন্দির দেখ্‌তেই মেঘ করে বৃষ্টি নামল। মুষলধারে বৃষ্টি। ছাড়াছাড়ি নেই, শিব, মীনাক্ষি ত দেখা হয়েছে; বিষ্ণুমন্দির দেখ্‌তেই হবে। বৃষ্টির মধ্যেই কোন রকমে মাথা বাঁচিয়ে মন্দির দেখা গেল।

সকালে মীনাক্ষি মন্দিরের সীমানার মধ্যেই একটা বাজার দেখেছিলাম। দেখ্‌বার মত বাজার। বেশ সারিবন্দী দোকান; আর এক-এক রকম দ্রব্যের এক-এক সারি। একটা দিক সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনীয়। সেটী মাদুরার বিখ্যাত কাপড়ের দোকান। মধ্য দিয়ে পথ; একপাশে দোকান, আর একপাশে সেই দোকানের কারুরা বস্ত্র বয়ন করছে। এমন অনেক দোকান। মহারাজ অনেক দ্রব্য পছন্দ করে ষ্টেসনে নিয়ে যেতে বললেন। সুধু বস্ত্র নয়, কাঁসা-পিতলেরও অনেক জিনিষ। দ্বিপ্রহরে ষ্টেসনের পার্শ্বে যেখানে মহারাজের সেলুন ছিল, সেখানে যথারীতি বাজার বসে গিয়েছিল। আমার নিদ্রাভঙ্গের পর সেলুন থেকে নেমে দেখি বাজার। পুলিশের ইন্‌স্পেক্টর ও কনষ্টেবলেরা সেই জনতার মধ্যে শান্তি রক্ষা করছেন। আমি কিন্তু সেখানে কিছু কিনি নাই। দোকানদারেরা বেশ একটা দাঁও পেয়ে দ্বিগুণ ত্রিগুণ মূল্যে দ্রব্যাদি বেচতে লাগল।

তার পর পুনরায় যাত্রা করে বৃষ্টিতে ভেজা। কিন্তু রাও বাহাদুর নাছোড়বান্দা। তাঁর প্রোগ্রাম ঠিক রাখতেই হবে। বিকেলে বাকী কয়টা মন্দির দেখবার পর আমাদের ঘোড়-দৌড়ের মাঠ

দেখ্‌তে যাওয়ার কথা ছিল। এদিকে ঘোর বৃষ্টি; রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে গিয়েছে, বৃষ্টিও জোরে পড়ছে; কিন্তু প্রোগ্রাম-মত ঘোড়-দৌড়ের মাঠ দেখ্‌তে যেতেই হবে। আমাদের মোটরের পাশে আচ্ছাদন নেই, স্থতরাং বৃষ্টির জলে একেবারে ভিজতে-ভিজতে রাস্তার জল ঠেলে সন্ধ্যার সময় সেই জনশূন্য মাঠ দেখ্‌তে গেলাম। জনমানব নেই, গাড়ী ঘোড়া নেই, স্থধু সেই অন্ধকারে বৈদ্যুতিক আলোগুলো ভূতের মত দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘোড়-দৌড়ের মাঠ সহর থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। ফিরবার সময় বৃষ্টি কমে গেল, কিন্তু বাতাসের খুব জোর, মোটরেরও দ্রুতগতি; স্থতরাং ভিজে কাপড় শুকিয়ে গেল। ওখান থেকে পুনরায় আমরা মীনাক্ষি মন্দিরের দ্বারে গেলাম; অভিপ্রায় ছিল যে, ভিতরে গিয়ে আরতি দর্শন করা যাবে। কিন্তু তখন আবার বৃষ্টি আরম্ভ হোলো, রাস্তাতেও জল দাঁড়িয়ে গেছে। মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার বৈদ্যুতিক আলোতে উজ্জ্বল হয়েছিল। তাই গাড়ীতে বসে সেই আলোকমালা দেখে নিয়ে, বৃদ্ধ রাও বাহাদুরকে তাঁর বাড়ীতে নামিয়ে দিয়ে আমরা ষ্টেসনে এলাম। তখন প্রায় ৮টা। ৯—১৫ মিনিটে আমাদের গাড়ী ছাড়বে। ষ্টেসনেই আহারাদি শেষ করে গাড়ীতে বস্‌লাম। গাড়ী ছাড়বার মিনিট দশেক আগে একজন দোকানদারের কাছ থেকে বেশ সস্তায় আমি কিছু কাপড় কিন্‌লাম। দুষ্ট রামেশ্বরের কৌশলেই দোকানদার যা-হয়-তাতেই শেষ মুহূর্ত্তে বেচে গেল। তার পর গাড়ী ছাড়ল।

আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী বলা হোলো বটে, কিন্তু তাতে মাদুরার কথা ত শেষ হোলো না, হোতে পারে না। যে মাদুরার মন্দিরাদি দেখে ইউরোপীয় ভ্রমণ-কারীরা বলেছেন 'Madura is the Athens of India,' সেই মাদুরার কথা এমন করে শেষ করতে পারা
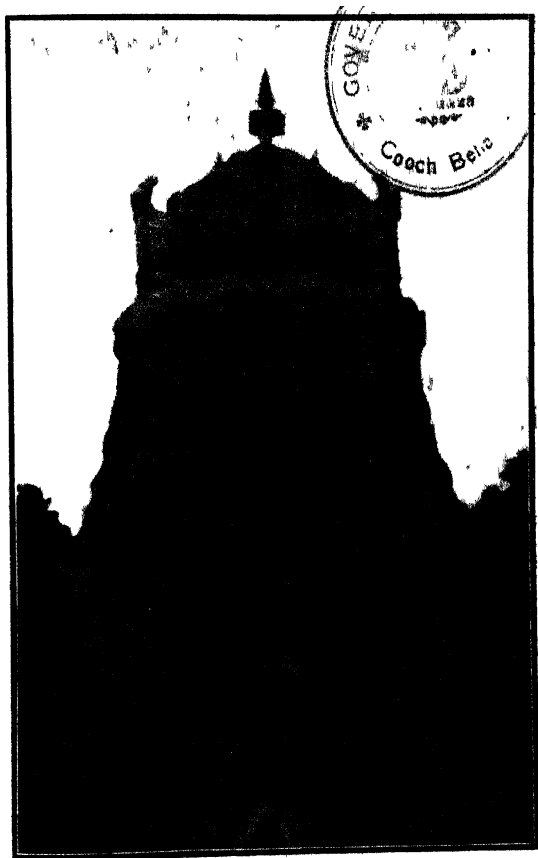
স্বর্ণ-মন্দিরের সম্পূর্ণ দৃশ্য

যায় না। তাই, অতি সংক্ষেপে মাদুরার সম্বন্ধে দুই চারিটী কথা এখানে বল্‌ব।

মাদুরা সহরকে পূর্ব্বে কদম্ববন নামে অভিহিত করা হোতো, কারণ

স্বর্ণ-মন্দির—মাদুরা

এখানে অনেক কদম্ব গাছ ছিল। সেই কদম্বের স্মৃতিরক্ষার জন্য সুন্দরেশ্বর মন্দির প্রাকারের পার্শ্বে একটী সেই সময়ের কদম্ব বৃক্ষ সযত্নে রক্ষিত হয়েছে; সহরের আর কোনও স্থানে কিন্তু আমরা কদম্ব গাছ দেখেছি বলে মনে হয়

না। প্রবাদ এই যে, মরুপর্ব্বতে যে চারিটী পবিত্র বৃক্ষ ছিল, এই কদম্ব বৃক্ষটী তাহার অন্যতম।

কেমন করে এই স্থানটী লোকের দৃষ্টি প্রথমে আকর্ষণ করেছিল, তার কাহিনী বল্‌ছি। বর্ত্তমান মাদুরার কয়েক মাইল দূরবর্ত্তী মানাভুর গ্রামের ধনঞ্জয় নামে এক সওদাগর একদিন দূর-দেশ থেকে বাণিজ্য করে দেশে ফিরবার সময় এই কদম্ববনের মধ্যে উপস্থিত হন। তখন সন্ধ্যা সমাগত। সেদিন সোমবার। ধনঞ্জয় এই বনের মধ্যে প্রবেশ করে একস্থানে দেখেন যে, স্বয়ং ইন্দ্র সেই বনমধ্যস্থ একটী স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গের পূজা করছেন। এখানে যে এমন জাগ্রত দেবতা লুকিয়ে আছেন, এ কথা কেহ জানত না। কিন্তু দেবতাদের অজ্ঞাত ত কিছুই নেই। তাই স্বর্গ ত্যাগ করে ইন্দ্রদেব এই পবিত্র সোমবাসুরে স্বয়ম্ভূ শিবের পূজা করতে এখানে এসেছিলেন। বণিক ধনঞ্জয় এই ব্যাপার দেখে পরদিন রাজার কাছে নিবেদন করলেন। রাজা তখন জঙ্গল কাটিয়ে স্থাপত্য-শিল্পশাস্ত্র অনুমোদিত মন্দির ও অট্টালিকা প্রভৃতি নির্ম্মাণ করে, এই সুন্দর নগর স্থাপিত করলেন। সহরটী কুণ্ডলীকৃত সর্পের আকারে নির্ম্মিত; আর এ নির্ম্মাণ-প্রণালী কোন স্থপতির মাথা থেকে আসে নাই; স্বয়ং সুন্দরেশ্বর রাজাকে এই সর্পের কুণ্ডলী আকারে নগর নির্ম্মাণ করতে উপদেশ দেন; এবং নগরের পরিধি কতদূর বিস্তৃত হবে, তা দেখাবার জন্য একটী সর্প প্রেরিত হয়। সেই সর্প যতখানি স্থান জুড়ে তার বিশাল দেহ চক্রাকারে রক্ষা করেছিল, নগরের সীমাও তদনুসারে নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। এই ত গেল নগর নির্ম্মাণের পৌরাণিক কাহিনী।

তার পর আর এক কাহিনী শুনুন। দেবরাজ ইন্দ্রের স্বভাব-চরিত্র ভাল ছিল না, এ-কথা সকলেই জানেন। তিনি একবার দেবগুরু বৃহস্পতির বিশেষ বিরাগভাজন হন এবং গুরু তাঁহাকে অভিশাপ প্রদান

করেন। দেবতা ও মুনি-ঋষিরা যেমন অভিশাপ দিয়া থাকেন, তেমনি আবার পরক্ষণেই স্তবে তুষ্ট হয়ে শাপ-মুক্তিরও পন্থা ব'লে দেন। ইন্দ্রের অভিশাপের বেলায়ও তাই হোলো। ইন্দ্রের স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে বৃহস্পতি
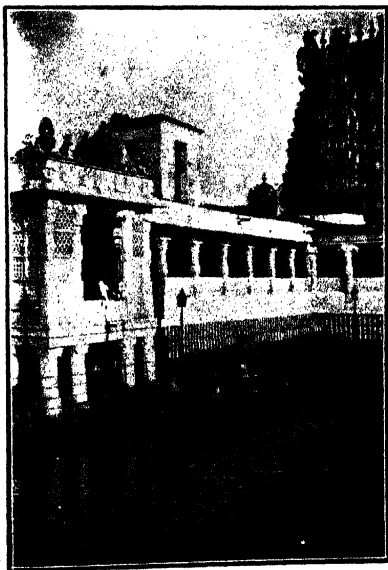
স্বর্ণ-মন্দিরের অপর পার্শ্ব—মাদুরা

বল্‌লেন "মর্ত্ত্যে গমন করে মাদুরায় যে সুন্দরেশ্বর আছেন, তাঁহাকে চৈত্র মাসের পূর্ণিমা তিথিতে যথারীতি পূজা করে তাঁর সন্তুষ্টিবিধান করতে পারলে তোমার শাপমুক্তি হবে।" ইন্দ্র তাই করে শাপমুক্ত হলেন

এবং তাঁরই আদেশে সুন্দরেশ্বর মূর্ত্তি অষ্ট-ঐরাবতের উপর প্রতিষ্ঠিত হোলো। সেই হতে চৈত্র পূর্ণিমায় এখানে মহোৎসব হয়; এখনও তেমনই সমারোহে উৎসব হয়ে থাকে।

আরও একটা কথা। এই মাতুরাতেই পাণ্ড্য-রাজবংশে স্বয় দেবী কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম হয় মীনাক্ষি দেবী; এবং সুন্দরেশ্বর এই মীনাক্ষি দেবীকে বিবাহ কবেন। তাই, মাতুরাব মন্দিরে যেমন সুন্দরেশ্বরের পূজা হয়, তেমনই দেবী মীনাক্ষিরও পূজা মহাসমারোহে সম্পাদিত হয়। আমাদের ত দেখে মনে হোলো, মীনাক্ষিদেবীর মন্দিবেব শোভাই অধিক।

মাতুরার সহস্র-স্তম্ভ-মণ্ডপ এক আশ্চর্য্য দৃশ্য। ভারতবর্ষেব কোথাও এমন সুন্দর, এমন উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-সমন্বিত বিশাল মণ্ডপ আর নাই। শিল্প-শাস্ত্রবিদেরা বলেন, এই মণ্ডপের প্রত্যেক স্তম্ভ, এমন কি প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড শিল্প-শাস্ত্রানুমোদিত নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়েছিল।

এই সুবিশাল মন্দিরের পার্শ্বে একটী সরোবর আছে। তাহাব চারিদিকে ঘাট এবং সুপ্রশস্ত পথ ও চলন (Corridor)। এই চলন একটী প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান; কারণ এই চলনে সুন্দবেশ্বরের চৌষট্টি লীলা-কাহিনী বিভিন্ন ভাবে চিত্র দ্বারা উৎকীর্ণ হয়েছে। এই চৌষট্টি লীলা-কাহিনীর অন্ততঃ দুই চারটা না বল্‌লে মাতুরার এই বিশাল মন্দিরের ও অধিষ্ঠিত দেবদেবীর মহিমা-কীর্ত্তন যে অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কাহিনীগুলিও অতি সুন্দর; সুতরাং অতি অল্প কথায় এই চৌষট্টিটী কাহিনীর অল্প কয়েকটী লিপিবদ্ধ করবার লোভ কিছুতেই সংবরণ করতে পারলাম না।

কেমন করে মাতুরা নগরী স্থাপিত হয়েছিল, তার কাহিনী পূর্ব্বেই বলেছি; কিন্তু এই লীলা-কাহিনীর একটীতে আরও একটু বেশী জান্‌তে পারা যায়। ধনঞ্জয় বণিক যে রাজার কাছে এসে কদম্ব-বনের মধ্যে ইন্দ্রের

তিরুমলয় নায়কের প্রাসাদের অভ্যন্তর-দৃশ্য

শিবপূজার কথা নিবেদন করেছিলেন, সেই রাজার নাম কুলশেখর পাণ্ড্য। এই কাহিনীতে মাদুরা নামের উৎপত্তির কথাও আছে। রাজা নগর স্থাপন করে, কি নাম দেবেন, ভেবে পাচ্ছিলেন না; এমন সময় শিব তাঁর নিকট উপস্থিত হ'য়ে তাঁর জটা থেকে কয়েক বিন্দু মধু ছিটিয়ে দিলেন; আর সেই ঘটনা থেকেই নগরের নাম হোলো মধুরা। সেই মধুরাই ক্রমে মদুরা, শেষে মাদুরায় পরিণত হয়েছে।

আর একটী লীলা-কাহিনীতে মীনাক্ষি দেবীর বিবাহের বিবরণ আছে। মীনাক্ষি দেবী যে পাণ্ড্য রাজবংশে কেন জন্মগ্রহণ করেন, তাহার ইতিহাস আছে। পাণ্ড্যরাজ মলয়ধ্বজ চোলবংশীয় রাজা শূরসেনের কন্যাকে বিবাহ করেন। বহুদিন গত হলেও যখন তাঁর কোন সন্তান হোলো না, তখন তিনি পুত্র-কামেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ করেন। এই যজ্ঞের কুণ্ড হতে মীনাক্ষিদেবী বহির্গত হন এবং তার পর সুন্দরেশ্বরের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলেছি। সেই বিবাহে এত দ্রব্য-সামগ্রী আহরিত হয়েছিল যে, বিবাহ শেষেও অনেক দ্রব্য বেঁচে গেল। তখন মীনাক্ষি দেবী শিবের সহচর বামন গুপ্তধারাকে ডেকে পাঠালেন। ইনি এমনই সুভোক্তা ছিলেন যে, যত আহার্য্য দ্রব্য ছিল, তার সব আহার করেও তাঁর ক্ষুধা নিবৃত্তি হোলো না। তখন দেবী অন্নপূর্ণেশ্বরী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হয়ে বামনের দুর্জ্জয় ক্ষুধার অন্ন পরিবেশন করেন। এখনও পাণ্ডারা মন্দিরের মণ্ডপের পার্শ্বে একটা গর্ত্ত দেখিয়ে বলে যে, এই অন্ন-খুলিতে দেবী অন্নপূর্ণা বামন-ভোজনের জন্য অন্ন পাক করে ঢেলে রেখেছিলেন।

আর একটা কাহিনীতে আছে যে, দেবী মীনাক্ষির মাতা কাঞ্চন-মালার সঙ্গে দুর্ব্বাসা ঋষির সমুদ্র-স্নানের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। সুন্দরেশ্বর এই কথা শুনে মাদুরার মন্দিরের পার্শ্বে সপ্ত সমুদ্রের জল আসবার জন্য ঝরণা করে দিলেন। এজুকাডাল নামক যে সরোবর এখনও

রাজা মুথু তিরুমল নায়েক ত্রিচিনোপলীতে রাজত্ব করতেন। তিনি এক সময় অতিশয় অসুস্থ হয়ে পড়েন। চিকিৎসকেরা তাঁহার রোগ চিকিৎসার অতীত বলে মত প্রকাশ করেন। নায়েক মহাশয় তখন অনন্যোপায় হয়ে মাদুরার সুন্দরানন্দ ও মীনাক্ষি দেবীর নিকট ধরণা দিবার জন্য যাত্রা করেন। পথিমধ্যে এক স্থানে সুন্দরানন্দ ও মীনাক্ষি দেবী স্বপ্নে তাঁর নিকট আবির্ভূত হয়ে বলেন যে, নায়েক মহাশয় যদি ত্রিচিনোপলী ত্যাগ করে মাদুরায় তাঁহার রাজধানী স্থাপন করেন এবং সেখানকার মন্দিরাদির সমৃদ্ধি সাধন করেন, তা হলে তিনি নীরোগ হতে পারবেন। তাঁরা নায়েক মহাশয়ের রোগ-মুক্তির জন্য তাঁহার হস্তে ভস্মের মত একটা পদার্থও প্রদান করেন এবং বলেন যে, এই ভস্ম শরীরে মাখতে হবে এবং ঔষধের মত খেতেও হবে। তার পরেই নায়েক-রাজের ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি তখনই তাঁর সঙ্গী ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে ও সভাসদ্‌দিগকে ডেকে স্বপ্নের কথা বল্‌লেন। স্বপ্নে প্রাপ্ত ঔষধ ব্যবহার করে রাজা রোগমুক্ত হলেন। তিনি আর ত্রিচিনোপলীতে ফিরে গেলেন না। মাদুরাতেই রাজধানী স্থাপিত হলো। সুন্দরেশ্বর ও দেবী মীনাক্ষির মন্দিরের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হোলো; অনেক নূতন অট্টালিকা নির্ম্মিত হোলো; এবং যে প্রাসাদের কথা বল্‌লাম, সেই সুন্দর প্রাসাদও ধীরে ধীরে নির্ম্মিত হোলো। তিরুমল নায়েকের পৌত্র চোক্কাণধানের কিন্তু মাদুরা ভাল লাগল না; তিনি তাঁর রাজধানী পুনরায় ত্রিচিনোপলীতে স্থাপিত করলেন এবং মাদুরার রাজপ্রাসাদের অনেক বহুমূল্য সাজ-সজ্জা ত্রিচিনোপলীতে নিয়ে গেলেন; এমন কি মাদুরায় নির্ম্মিত অনেক সুদৃশ্য প্রাসাদ পর্য্যন্ত ভেঙ্গে ফেলে তাদের উপকরণ ত্রিচিনোপলীতে নিয়ে গেলেন; সুধু এই প্রাসাদটীই তিনি দয়া করে রেখে গেলেন। শুনা যায়, এই প্রাসাদও নাকি ইহা অপেক্ষাও বড় ছিল, এখন অংশ মাত্র রয়েছে। কিন্তু, এই সামান্য অংশ দেখেই লোকে এর প্রশংসা

না ক'রে থাকতে পারে না। এই প্রাসাদটী মাদ্রাজের গবর্ণর লর্ড নেপিয়ারের সময় সরকারের অধিকারভুক্ত হয়। এখন এখানে গবর্ণমেণ্টের অনেকগুলি আফিস স্থাপিত হয়েছে।

সুন্দরেশ্বরের মন্দির থেকে তিন মাইল দূরে, নগরের প্রান্তে একটী সুদৃশ্য সরোবর আছে; তাহার নাম টেপাকুলম্। তিরুমল নায়েকের প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য যখন মাটীর দরকার হয়েছিল, তখন এই স্থান হতে মাটী তোলা আরম্ভ হয়। সেই সময় একদিন মজুরেরা মাটী খুঁড়তে-খুঁড়তে প্রকাণ্ড এক দেবমূর্ত্তি দেখতে পায়। সেই মূর্ত্তির নাম বিনায়ক। তখনই রাজার কাছে সংবাদ গেল। তিনি এসে মূর্ত্তি দেখ্‌লেন এবং আদেশ দিলেন যে, যেখানে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে, ঠিক সেইখানেই তাঁর জন্য মন্দির নির্ম্মাণ করে তাঁকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাই এই সরোবর হোলো এবং সরোবরের ঠিক মাঝখানে মূর্ত্তি পাওয়া গিয়েছিল, সেইখানেই মন্দির নির্ম্মিত হোলো। চারিদিকে জলবেষ্টিত এই মন্দিরটী দেখিতে অতি সুন্দর। এখনও সেই মন্দিরে বিনায়ক দেবের যথারীতি পূজা হয়ে থাকে।

মাদুরার আশে-পাশে দশ মাইলের মধ্যে আরও অনেক মন্দির আছে। সে সকলই তিরুমল নায়েক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। আমরা সময়াভাবে এগুলি দেখ্‌তে যেতে পারি নাই। তবে, এই মাত্র বল্‌তে পারি, মাদুরার সুন্দরেশ্বর ও দেবী মীনাক্ষির মন্দির ও তিরুমল নায়েকের প্রাসাদ দেখলেই এতদূরে আসা সফল হয়। আমি ত অকুণ্ঠিত-চিত্তে বল্‌তে পারি যে, ভারতবর্ষের মধ্যে নানা স্থানে যে সকল দেব-দেবীর মন্দির দেখেছি এবং যেগুলি দেখিনি কিন্তু নানা পুস্তকে যাদের বিবরণ পড়েছি ও ছবি দেখেছি, তাদের সকলের উপর স্থান পাবার দাবী করতে পারে এই মাদুরার মন্দিরাদি। বলিতে কি মাদুরার প্রসিদ্ধিই এই সকল মন্দির থেকে। এখন অবশ্য মাদুরা ব্যবসায়-বাণিজ্যেরও একটা কেন্দ্র হয়েছে;

টেপাকুলম্ সরোবর—মাদুরা

মাদ্রাজি সাড়ী ব'লে যে সকল উৎকৃষ্ট বস্ত্র ভারতের সর্ব্বত্র বিক্রীত হয়, তাব অধিকাংশই এই মাদুরায় নির্ম্মিত হয়ে থাকে। সহবও, পর্ব্বেই বলেছি, নিতান্ত ছোট নয় ; তবে বাড়ী-ঘর প্রায় সবই সেকেলে ধরণের ; পাশ্চাত্য প্রভাব যেন এখানে তেমন বিকাশ লাভ কবে নাই। সুধু মাদুবা কেন, দক্ষিণাপথেব অনেক সহবেই দেশী ভাব বেশী প্রবল ব'লে মনে হোলো ; অথচ, যাঁবা ঐতিহাসিক তাঁবা এক-বাক্যে সাক্ষ্য দেবেন যে, এই পাশ্চাত্য সভ্যতা সর্ব্বাগ্রে এই মাদ্রাজ প্রদেশেই আত্ম-প্রকাশ কবেছিল ;—মাদ্রাজই বিলাতী সভ্যতা তথা ইংরাজ-শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম লীলা-ভূমি।

ত্রিচিনোপলী ও শ্রীরঙ্গম্

২রা অক্টোবর, ১৬ই আশ্বিন, শুক্রবার—

ভোব ৪—১৫ মিনিটেব সময আমদেব গাড়ী ত্রিচিনোপলীতে পৌঁছিল। আমি স্থিব কবেছিলাম, প্রাতঃকালে কাবেবী নদীতে স্নান কবব কাবণ সেদিন পূর্ণিমা তিথি। এমন দিনে কাবেবী নদীতে স্নান কবে একটু পুণ্য অর্জ্জন কববাব লোভ হযেছিল কিন্তু ললিত ভয দেখাল যে কাবেবীতে ভযানক কচ্ছপ—জলে নামা যায় না। আব সে সব কচ্ছপ সাধু পাপী বিচাব কবে না—পুণ্যার্থীকেও ছেড়ে দেয না। কাজেই গাড়ীতেই স্নানেব ঘবে দাঁড়িযে গঙ্গেচ থেকে আবম্ভ কবে কাবেবী পর্য্যন্ত নাম উচ্চাবণ কবে স্নান শেষ কবা গেল। চা-পানটা কাবেবী স্নানেব জন্য মুলতবী বেখেছিলাম, স্নানই যখন হোলো না, তখন চা পান আব বন্ধ থাকে কেন, সেটাও সেবে নেওয়া গেল।

প্রাতে সাড়ে সাতটায আমাদেব মন্দিবাদি দেখতে যাওযাব ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বে যেদিন অর্থাৎ বামেশ্বব যাওযাব সময মঙ্গলবাব সাড়ে বাবটায় এখানে এসেছিলাম, সেদিন ত্রিচিনোপলীব কিছুই দেখা হয় নাই, সে ব্যবস্থাও ছিল না, আমবা ষ্টেসন থেকে মোটবে চড়ে তাঞ্জোব চলে গিয়েছিলাম। আজ আমবা ত্রিচিনোপলী ও শ্রীবঙ্গম্ ভাল কবে দেখে বেলা ১৷৷০ টাব গাড়ীতে বাঙ্গালোর যাত্রা কবব।

চাবিখানি মোটব আমাদের জন্য ষ্টেসনে হাজিব ছিল। আমবা প্রথমেই পাহাড়েব উপবিস্থিত গণেশ মন্দিব দেখতে গেলাম। এই পাহাড়ই

ত্রিচিনোপল্লীর প্রধান দ্রষ্টব্য। দূর থেকে পাহাড় দেখেই বুঝলাম, আমার মত বৃদ্ধের এত সিঁড়ি ভেঙ্গে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গণেশ মন্দির দর্শন অসম্ভব। স্থির করলাম, সে চেষ্টা করব না। নীচে বসে থাকব, এবং আর সকলের কাছে শুনে এবং পর্ব্বতশীর্ষে অধিষ্ঠিত সেই মন্দিরের দেবতা গণেশের নাম স্মরণ করে প্রণাম পাঠিয়েই কৃতার্থ হব।

পাহাড়টী রাস্তার লেভেল থেকে ২৭৩ ফিট উচ্চ। আর আমি তাই দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। হায় হিমালয় পরিব্রাজক!

যাক্, পাহাড়ের পাশে গিয়ে দেখি বিপুল আয়োজন। হাতী, ঘোড়া, উট, লোক-লস্করে স্থানটী একেবারে বোঝাই। এ সব ব্যবস্থা আয়েঙ্গার মহাশয়েরাই করেছিলেন। ভোরেই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মহাশয় মোটর নিয়ে ষ্টেসনে হাজির ছিলেন। পাহাড়ের প্রবেশ-দ্বারের বাইরেই মন্দিরের ট্রাষ্টি শ্রীযুক্ত কাশী বিশ্বনাথ চেটিয়ার মহাশয় সদলবলে উপস্থিত ছিলেন।

আমরা পৌঁছিতেই বাজনা বেজে উঠল; সঙ্গে-সঙ্গেই ফুলের মালা, নারিকেল প্রভৃতি পাওয়া গেল। শোভাযাত্রার অনুসরণ করে নাট-মন্দিরের মধ্যে গিয়ে দেখি, যেখান থেকে সিঁড়ি আরম্ভ হয়েছে, সেখানে চারখানি ইজিচেয়ার রয়েছে; মকমলের গদি মোড়া, দুইদিকে লম্বা চিত্রিত বাঁশ বাঁধা; আর চারখানি গদি-মোড়া চেয়ারেও বাঁশ বাঁধা রয়েছে। তখন বুঝতে পারা গেল, ইজি চেয়ার চার'খানা মহারাজা বাহাদুর, কুমারদ্বয় ও ভগবতীর জন্য; বাকী চারখানা ললিত, ডাক্তার, রামেশ্বর ও আমার জন্য। প্রত্যেকখানির জন্য আটজন হিসাবে বেহারা, অর্থাৎ ৬৪জন বেহারা হাজির। এ ব্যবস্থা কিন্তু শ্রীযুক্ত ধিরাজকুমার বাহাদুর উল্‌টে দিলেন। তিনি তিনজন নাবালককে (অর্থাৎ মহারাজ, ছোটকুমার ও আমি) বড় ইজিচেয়ারওয়ালা দোলায় তুলে দিবার ব্যবস্থা করলেন। তিনি হেঁটেই যাবেন, সুতরাং ললিত, ডাক্তার, রামেশ্বর ও ভগবতীকেও

হেঁটেই উঠ্‌তে হবে। আমি বিশেষ আপত্তি করলাম। কিন্তু ধিরাজ-কুমার বাহাদুর জোর করে আমাকে দোলায় বসিয়ে দিলেন। প্রথমে মহারাজার দোলা, তার পরেই ছোট কুমারের, তার পরেই আমার দোলা অগ্রসর হোলো। অন্যগুলো সেখানেই পড়ে রইল। বাজনদাররা ঘোর রবে নানা বাদ্যযন্ত্র বাজাতে বাজাতে সিঁড়ি উঠতে লাগল। আর আমরা দোলায় আসীন। লোকেরা বলাবলি করতে লাগল, আগাড়ি মহারাজা, পিছে ছোটা কুমার বাহাদুর, সবসে পিছে মন্ত্রী মহারাজ (এই হতভাগা)। বড়া কুমার বাহাদুর পায়দল যাতা। যাক, দু-তিন ঘণ্টার জন্য মন্ত্রী মহারাজ হওয়া গেল। একেই বলে আবুহোসেন গিরি! আর কি সুন্দর আমাদের এই তীর্থ-ভ্রমণ! এমন রাজার হালে ভ্রমণ হতে পারে বটে; কিন্তু আমরা গরীব মানুষ—আমাদের তীর্থ-ভ্রমণের ধারণাটা ঠিক এর উল্‌টো! আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছি যে, খুব কঠোর কষ্ট স্বীকার না করলে না কি তীর্থ করাই হয় না। অনেক সময় দেখেছি, অনেকে রাস্তায় লম্বমান হয়ে প্রণাম করতে-করতে পুরুষোত্তমে গিয়ে থাকেন। আমিও ইতঃপূর্ব্বে যা-সামান্য কিঞ্চিৎ তীর্থ-ভ্রমণ করেছি, তাতেও যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছিল। আর এবার—এবার হিন্দুর পরম-পবিত্র তীর্থ দেখ্‌তে এসেছি রাজেন্দ্র-সঙ্গমে, সুতরাং এক্ষেত্রে কষ্ট স্বীকার করবার কোন দরকারই হোলো না। তবে, তীর্থ-দর্শনের ফলাফলের কথা—তা যিনি এই তীর্থ-ভ্রমণের অগ্রণী, যাঁর অনুগ্রহে এত দূর-দেশে তীর্থ-দর্শনে আসা হয়েছে, তিনিই সে কথার জবাব দেবেন,—আমি সঙ্গীমাত্র।

পাহাড়ের নিকটে গিয়েও আমি মনে করেছিলাম, পাহাড়ের মাথার উপর যে মন্দির দেখা যাচ্ছে, ঐটী মাত্র মন্দির, আর সবটা পাহাড়। কিন্তু কয়েকটী সিঁড়ি উঠেই বুঝতে পারা গেল, আগাগোড়া পাহাড়ের গর্ভ খুঁদে

অসংখ্য দেব-দেবীর মন্দির, নাটমন্দির, পূজারি ও লোকজনের বাস-কক্ষ তৈরী করা হয়েছে, আর সেই অন্ধকারময় মন্দির প্রভৃতিতে আলোক প্রবেশের জন্য পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট জানালা আছে। নীচে
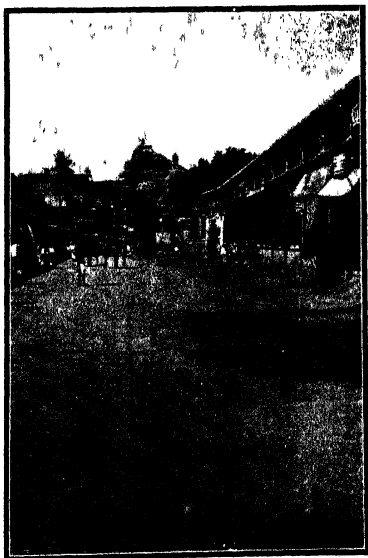
দূর হইতে মন্দিরের দৃশ্য—ত্রিচিনোপলী

থেকে এই জানালাগুলো বিশেষ নজরে পড়ে না। বলতে গেলে সারা পাহাড়টা দেবদেবীগর্ভ। গণে দেখিনি, কিন্তু মনে হোলো সমগ্র পাহাড়টী তিন চার তলায় বিভক্ত করে মন্দিরে বোঝাই করা হয়েছে!

আমরা কিন্তু উপরে যাবার সময় কোন তলাতেই নামি নাই। একেবারে পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলাম। সেখানে একটী ছোট মন্দির, তার চারিদিকে খোলা বারান্দা। তার উপরেও একটা তলা আছে, সেটা মন্দিরের মাথার উপর। পাশে একটা কাঠের সিঁড়ি ছিল। তাই দিয়ে উপরে উঠে যে দৃশ্য আমাদের নয়ন-সম্মুখে উদ্ভাসিত হোলো, তা অবর্ণনীয়! অত বড় ত্রিচিনোপলী সহর যেন বালকবালিকাদের খেলাঘর বলে মনে হতে লাগল। দূরে কাবেরী নদী সূতার মত বয়ে যাচ্ছে। তিনি যে একটা নদী তা বলে মনেই হোলো না— একটা যেন হাত দুই চওড়া খাল। কাবেরীব উপরকার সাঁকো যেন ছোট একটা এক-পেয়ে ফুটপাথ বলে মনে হোলো। এই সাঁকো পার হয়ে ও-পারে মাইল-দুই গেলেই শ্রীরঙ্গম্ সহর ও মন্দির।

এই পর্ব্বতের চূড়ায় যেমন মন্দির ও দেবতা রয়েছেন, তেমনি শ্বেতাঙ্গ-দেবতা ইংরেজের পতাকা-দণ্ডও (flag-staff) রয়েছে। পাশেই একটা বন্ধ ছোট ঘর। এর মধ্যে নাকি বন্দুক প্রভৃতি আছে। সাহেবেরা এক সময় এই পাহাড়ের মন্দির, মণ্ডপ, চত্বর গোলাগুলি বারুদের আড্ডা করেছিলেন। পর্ব্বত-শীর্ষে চৌকী-ঘর (watch-tower) হয়েছিল। এখনও চৌকী-ঘর আছে, তবে তা আর ব্যবহৃত হয় না। এ সকলেব বিবরণ পরে বল্‌ছি।

সেই পর্ব্বত-শীর্ষে দাঁড়িয়ে মহারাজ ও যুবরাজকুমার অনেকগুলি ফটো নিলেন। সেখান থেকে নেমে মন্দিরে প্রণামী দিয়ে ও মালা প্রভৃতি নিয়ে কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই একটা ঘর দেখা গেল। সে ঘরে প্রকাণ্ড একটা ঘণ্টা ঝুলান আছে। একজন লোক উপর থেকে চাকা ঘুরালেই ঘণ্টা বেজে উঠে। আর সেই বিশালকায় ঘণ্টার ধ্বনি সহরের সুদূর প্রান্ত থেকে পর্য্যন্ত শোনা যায়। তারপর কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই একটা তলা;

আর সেখানে এক-দফা দেবদেবীর মন্দির, মণ্ডপ, আর ছোট ছোট অসংখ্য কক্ষ। এমন বহু দেবদেবী সেই অন্ধকার পাহাড়ের বুকের মধ্যে প্রদীপ জ্বেলে যাত্রীর কাছে পূজা ও দক্ষিণা পাবার আশায় ব'সে আছেন। সকলেরই মন্দির আছে, সকলেরই মণ্ডপ আছে। সবাই বড় বড় দেবতা, কেউ কম নন। এই তলার সমস্ত দেবদেবীকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করে, মশালের সাহায্যে আর একতলা নীচে নামলাম, সেখানেও বহু দেবদেবী মন্দির, চত্বর,—ঠিক উপরের তলার মত।

এ টুকু আমরা হেঁটেই নামলাম। এই সব দেখা শেষ করতে প্রায় সাড়ে নয়টা বেজে গেল। এই তলার নীচে আর তলা নেই। সুতরাং আমরা তিনজন আবার দোলায় উঠে নামতে লাগলাম। সমতলে এসে পাহাড়ের চারিপাশে যে সব দেবতা ছিলেন, তাঁদের দেখ্‌লাম। মহারাজ মুক্তহস্তে সকলকে দান করলেন। সেখানে যে-ভাবের যত প্রার্থী উপস্থিত ছিল, কেউ বাদ গেল না,—দেবদেবী ত নয়ই। তিনখানা দোলা গিয়েছিল, কিন্তু ৮খানি দোলার ৬৪ জন বাহককে ৬৪৲ টাকা দেওয়া হোলো। পাণ্ডা, মাহুত, সহিস, অসংখ্য ভৃত্য, অতিথি-অভ্যাগত কেহই নিরাশ হোলো না——এমন কি হাতী, ঘোড়া, গরু প্রভৃতিরও পেট ভ'রে খাবার ব্যবস্থা হোলো।

সেখান থেকে বেরিয়ে আমরা ত্রিচিনোপলীর ইতিহাস-বিখ্যাত মহম্মদ আলির সমাধি-মন্দির দেখতে গেলাম। এখানে একটা মন্দির ছিল; তাতে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। একজন সাধুর তত্ত্বাবধানে এই লিঙ্গমূর্ত্তির যথারীতি পূজা হোতো। মুসলমান নবাবেরা সেই মন্দিরের শিবলিঙ্গের উপরই মহম্মদ আলির সমাধি দিলেন। সাধু আর কি করবেন; একটা প্রার্থনা মাত্র জানালেন যে, রোজ যেন ঐ মন্দিরে একটী ঘৃতের প্রদীপ জ্বালা হয়। এই সামান্য অনুরোধ এখনও রক্ষিত হচ্ছে,

চেরাগের পাশে একটা ঘৃতের প্রদীপ এখনও দেওয়া হয়। এখানেও প্রণামী দিয়ে আমরা বেরুলাম।

এইবার কাবেরীর সেতু পার হয়ে ও-পারে শ্রীরঙ্গম্ দেখ্‌তে যেতে হবে। তখন দশটা বেজেছে। যেমন গরম, তেমনি রৌদ্র, আর তেমনি পথেব ধূলা—আর আমরা সকলেই নগ্নপদ। আমাদের একেবারে গলদ্‌ঘর্ম্ম কবে ফেলল। কিন্তু তা ব'লে ফিরবার যো নেই, আমাদের আজই ১টা-৩৫ মিনিটের গাড়ীতে ত্রিচিনোপল্লী ছাড়তে হবে, তার আগে শ্রীরঙ্গম দেখা চাই-ই।

কাবেরী নদী সেতুপথে পার হয়েও তিন মাইলের কিছু উপর গেলে তবে শ্রীরঙ্গমের মন্দিরে যাওয়া যাবে। আমবা খুব দ্রুত মোটর চালিয়ে সাড়ে দশটার সময় মন্দিরে পৌছিলাম। এ মন্দিরের সীমানা অনেকখানি, আর মন্দিরের সংখ্যাও কম নয়। এক-একটা বড় মন্দির, তাব আশে-পাশে কুড়ি-পঁচিশটা পৃথক পৃথক মন্দির। তারাও বড় ছোট নয়। সকল মন্দিরেরই মণ্ডপ ও চত্বর আছে; সেও প্রকাণ্ড। আব তাতে প্রস্তর-মূর্ত্তি, দেওয়ালে দেব-দেবীর কীর্ত্তি, তাও অসংখ্য। শ্রীরঙ্গমেব মন্দিরের একপার্শ্বে একটা পুকুর দেখলাম। সেটা জ্ঞানবাপী। জল একেবারে কালো; আর দুর্গন্ধে সেখানে দাঁড়ায় কার সাধ্য। এক স্থানে মন্দিরের দেবতার অলঙ্কারপত্র দেখ্‌লাম; সব বহুমূল্য হীরে জহরত। সেগুলি আমাদেরই দেখাবার জন্য বে'র করে সাজিয়ে রাখা হয়েছিল। এ সকল যাঁর জিম্মায় আছে, তিনি সশস্ত্র পার্শ্বে দণ্ডায়মান, নিকটে কয়েকজন প্রহরীও আছে।

এখান থেকে বার হয়েই গেলাম বিষ্ণুমন্দিরের দিকে। সেও এক বিশাল ব্যাপার। কতকগুলি হালের তৈরী মাটীর ছবি দেখলাম। কোনটায় শ্রীকৃষ্ণ গোবর্দ্ধন ধারণ করেছেন, কোনটায় পুতনা বধ, কোনটায়

বংশী-বাদন, কোনটায় কালীয়-দমন; কিন্তু, একটাও দেখলাম না রাসলীলা বা ঐ রকমের সখীদের নিয়ে ক্রীড়া। ছবিগুলি যারা তৈরী করেছে, তারা খুব ওস্তাদ। এরও আশে-পাশে অনেক মন্দির, নাটমন্দির মণ্ডপ ইত্যাদি। আমরা রোদে একেবারে ক্লান্ত। আর হাঁটতে-হাঁটতে পা ব্যথা হয়ে গিয়েছে। সব দেবতার মন্দির ঘুরে দেখতে সময়ও কম লাগে না। এমন কত যে বড় মন্দির দেখা গেল। একটী থেকে আর একটীতে যেতে গেলে রৌদ্র-তপ্ত পাথরের উপর দিয়ে, আর না হয় ততোধিক উত্তপ্ত বালুকারাশির উপর দিয়ে। কেহই আর খালি পায়ে চলতে পারছিনে। অথচ "Maharaja, this side please" "মহারাজ অনুগ্রহ করে এই দিকে আসুন" বললেই সবাই মিলে সেই দিকে যেতে হচ্চে। মহারাজও বলেন না যে, "আর চলতে পারিনে, ক্ষমা কর"; আমরাও সে কথা মুখে আনতে পারিনে। এদিকে মালা-চন্দন, দেবদেবীর কুলি ভস্মে আমাদের কাপড় জামা একেবারে মলিন হয়ে গেল; মহারাজের বহুমূল্য পোষাক রঞ্জিত হয়ে গেল।

তখন সাড়ে এগারটা। আমাদের আটজনকে আবার আয়েঙ্গার মহাশয়দের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে হবে। তাঁদের বাড়ী শ্রীরঙ্গম্ মন্দিরের সিংহদ্বারের সম্মুখেই। কিন্তু, তখন কার সাধ্য নিমন্ত্রণে যায়। ষ্টেসনে গিয়ে কাপড়-চোপড় ছেড়ে আবার স্নান না করে কিছুতেই আসা যায় না। তাঁদের সেই কথা বলে আমরা যাত্রা করলাম। কুড়ি মিনিটে ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। বিশ্রাম আর করা হোলো না, মোটরেই যা বিশ্রাম হয়েছিল, শরীরের ঘামও শুকিয়েছিল। ষ্টেসনে এসে স্নান করে, কাপড় বদল করে, বারটা বাজবার দুই এক মিনিট পরে আবার সেই কাবেরী পার হয়ে শ্রীরঙ্গমে আয়েঙ্গার মহাশয়দের বাড়ী গেলাম। মাননীয় শ্রীযুক্ত রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার মহাশয় সেই দিন এসে পৌঁছেছিলেন। মন্দিরের মধ্যেই আমাদের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল।

আমরা প্রায় সাড়ে বারটার সময় আয়েঙ্গার মহাশয়দের বাড়ী পৌঁছিলাম। সেখানে আর বিশ্রাম করা হোলো না। মিনিট দুইয়ের মধ্যেই আহারের ডাক পড়ল। গিয়ে দেখি, সকলের জন্যই কাঠের পিঁড়ি পাতা, তার সম্মুখেই কলাপাতা; তবে জল দিয়েছিল রূপার ছোট ছোট গ্লাসে। পাতে কিছুই সাজানো ছিল না। আমরা সবাই এক সাথে বসলাম। পার্শ্বের বারাণ্ডায় আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণ (ওই দেশী) বস্‌লেন। অন্য আসন নেই, সব কাঠের পিঁড়ি। আমাদের সম্মুখেই একখানি গালিচাতে বসে একজন ওস্তাদ সেতার বাজাতে লাগ্‌লেন। এদিকে পরিবেশনও আরম্ভ হোলো। ভাত, তরকারী পাঁচ সাত রকম, কুমড়ার ঘণ্ট, নানা রকম শাক ভাজা, টক, ক্ষীরের মতই যেন কি, দুই এক রকম পিঠে, এক রকম মিষ্টান্ন, আর লঙ্কা ও তেঁতুল দিয়ে ঝোল—বোধ হয় সেটা অম্বল। ললিত পূর্ব্বেই নিষেধ করে দিয়েছিল যে, লঙ্কা যেন বেশী দেওয়া না হয়। কিন্তু, এই যদি কম হয়, তা হলে বেশী যে কি তা বল্‌তে পারিনে। আমি ত সুধু ঘি দিয়ে ভাত মেখে কুমড়ার ঘণ্ট দিয়ে যা দুটী খেয়েছিলুম। মহারাজও বেরিয়ে এসে বল্‌লেন, তিনিও ঠিক তাই খেয়েছেন। আর সবাই সেই শক্ত মিষ্টান্ন পিঠে ইত্যাদি পেটের জ্বালায় খেয়েছিলেন; কিন্তু তরকারী, কি ডাল, কি লঙ্কার অম্বল কেউ মুখে দিতে পারেন নাই। মহারাজের মত অতিথিকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে; আর যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন, তিনিও বড় জমিদার, শিক্ষিত, সঙ্গতিপন্ন। সুতরাং তাঁরা যা আয়োজন করেছিলেন, তা যে সে-অঞ্চলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট খাদ্য, তা স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু, আমরা তা মোটেই খেতে পারলাম না। আর সে যে ধীরে ধীরে পরিবেশন, আর সেই লঙ্কা-তেঁতুলের অম্বল, সে দেশী ব্রাহ্মণ মহাশয়েরা বার বার চেয়ে নিয়ে খেতে লাগলেন, তাতে আমাদের গাড়ী ফেল করবার সম্ভাবনা হোলো। আয়েঙ্গারেরা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, তাঁদের

হিন্দু আচার-ব্যবহার খুব আঁটো। সুতরাং আমরা সবাই খেয়ে উঠে, আর একটা প্রকোষ্ঠ পার হয়ে তবে মুখ ধোবার স্থানে গিয়ে মুখ ধুয়ে এলাম। এ অভিজ্ঞতা আমাদের যথেষ্ট আছে, কিন্তু মহারাজের পক্ষে

পর্ব্বত মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার—ত্রিচিনোপলী

একেবারে নূতন। তার পর পান-শুপারী। সাজা পান এ-দেশে কেউ কাউকে দেয় না, দোকানেও নয়। থালা বা বাটায় করে পান, গোটা শুপারী (অর্থাৎ বড় বড় শুপারি-খণ্ড) আর চুণ। নিজে সেজে খেতে

হয়। মহারাজ একটু শুপারি নিলেন। আমরা পান শুপারী সবই নিলাম। পান কিন্তু অতি সুন্দর। মশলা নেই, সরু শুপারিও নেই, খয়েরও নেই, তা হোলেও পান খেয়ে বেশ তৃপ্তি অনুভব করা যায়।

একটা রাজল দেখে আমরা আর অপেক্ষা করতে পারলাম না। ষ্টেসনে যখন এলাম, তখন গাড়ী ছাড়তে পাঁচ মিনিট বিলম্ব ছিল। আমাদের সবই প্রস্তুত ছিল। গাড়ীতে গিয়ে বসলাম। গাড়ী ছেড়ে দিল। রাত্রি সাতটা পনর মিনিটে আমাদের গাড়ী এরোদ ষ্টেসনে পৌঁছিল। এখান থেকে সেলুন ছেড়ে দিতে হবে। কারণ আমাদের এখান থেকে Madras and South Marhatta Railএ উঠতে হবে। আমরা এখান থেকে South Indian Railএ রামেশ্বরের দিকে গিয়েছিলাম। তখন সেই পর্ব্বতপ্রমাণ দ্রব্যাদি অপর প্ল্যাটফরমে নিয়ে যাওয়া হোলো। আমরা সেলুনেই আহার শেষ করে নিলাম। চাকরেরা তাড়াতাড়ি সব বেঁধে নিয়ে এল। রাত ৯—৪৮ মিনিটে বাঙ্গালোর মেলে আমরা যাত্রা করলাম। জলারপেট ষ্টেসনে এসে আর সকলকে গাড়ী বদল করে বাঙ্গালোর মেলে উঠতে হয় রাত আড়াইটার সময়। আমাদের গাড়ী জলারপেটে কেটে নিয়ে বাঙ্গালোর মেলে লাগিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। তাই সেই শেষ রাত্রে কর্ম্মভোগ করতে হয় নাই, যাবার সময়ও নয়।

আমাদের পাঁচ দিনের তীর্থ-ভ্রমণ-কাহিনী এইখানেই শেষ হোলো, পরদিন প্রাতঃকালে আমরা বাঙ্গালোরে আমাদের প্রবাস-ভবনে উপস্থিত হলাম। ভ্রমণ কাহিনী শেষ হোলেও ত্রিচিনোপলী ও শ্রীরঙ্গমের একটু ইতিহাস বলা বাকী রয়ে গেছে। এই স্থানে সেই কথা কয়টী বলে নিই।

ত্রিচিনোপলীকে "দক্ষিণ কৈলাস" নামে অভিহিত করা হয়। পুরাণে তার কারণ বর্ণিত হয়েছে! ব্যাপারটী এই। কৈলাস পর্ব্বতে মহাদেব অবস্থান করছেন। একদিন কয়েকজন দেবতা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে

গিয়েছেন! কৈলাসে বোধ হয় অবারিত-দ্বার ছিল না; দেবতাগণ প্রবেশ-দ্বারে অপেক্ষা করছেন। এতগুলি দেবতা যে চুপ করে এক স্থানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বেন, তা হ'তেই পারে না,—তাঁরা নানা বিষয়ের আলোচনা কর্‌ছিলেন। অতিশেষ নাগও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বল্‌তে গেলে সর্পরাজ। উপস্থিত দেবগণ অতিশেষ সর্পের যথেষ্ট প্রশংসা করছিলেন; বল্‌ছিলেন যে, তাঁর তুল্য বলশালী আর কেউ দেবতাদের মধ্যে নেই। এই কথা শুনে বায়ুদেবের মনে অভিমানের সঞ্চার হোলো। তিনি রেগে বল্‌লেন যে, অতিশেষ যে সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী তা আমি মানি নে; আমিই সর্ব্বাপেক্ষা বলবান। এই কথা শুনে সকলেই তার প্রমাণ চাইলেন। তখন স্থির হোলো যে, সর্পরাজ কৈলাস পর্ব্বতকে তাঁর বিশাল দেহ দিয়ে জড়িয়ে ধরবেন; বায়ু যদি তাঁর সেই বেষ্টনী আলগা করতে পারেন, তা হলে তাঁকেই অধিক বলবান বলে স্বীকার করা হবে।

তখন অতিশেষ-সর্প কৈলাস পর্ব্বতকে তাঁর দেহ দিয়ে বেষ্টন করলেন, কোন স্থানে একটুও ফাঁক রাখলেন না। বায়ু তখন মহাবেগে প্রবাহিত হলেন। এমন ঝড়ের সৃষ্টি হোলো যে, গাছপাথর সব উড়ে যেতে লাগল, বাড়ী-ঘর সব কোথায় চলে যেতে লাগল। দেশময় আর্ত্তনাদ উঠ্‌ল; পৃথিবীর রসাতলে যাওয়ার উপক্রম হোলো। কিন্তু শেষ নাগের সে বজ্র-বেষ্টনী একটুও শিথিল হোলো না। বায়ু তখন কি করেন? আমরা (মানুষেরা) যা করে থাকি, তিনিও তাই করলেন। সবলের কাছে অপদস্থ হলে সে রাগটা দুর্ব্বলের উপর প্রয়োগ করা আবহমানকাল চলে আসছে। বায়ুদেবও আমাদের সেই সনাতন প্রথা অবলম্বন করলেন—সর্পরাজের কাছে অপদস্থ হয়ে নিরপরাধ বিশ্ববাসীর উপর তাঁর প্রভাব দেখাতে প্রবৃত্ত হলেন;—সমস্ত বিশ্বের বায়ু রোধ করে দিলেন। বায়ু রোধ হওয়ায় সৃষ্টি যায়-যায় হোলো। মহাদেব আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না—

তাঁর সৃষ্টি যে লোপ হয়! তিনি তখন অতিশেষ নাগকে মিনতি করলেন, বল্লেন, তিনি যেন তাঁর দৃঢ় বেষ্টনী একটু শিথিল করেন, নইলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে থাকে না। শিবের আদেশ ত অমান্য করা যায় না; অতিশেষ তাঁর দৃঢ় বন্ধন একটু শিথিল করলেন, আর বায়ু সুযোগ পেয়ে তাঁর প্রতাপ দেখাতে লাগলেন। কৈলাস পর্ব্বত কেঁপে উঠল, তার পাষাণ-শরীর চূর্ণ হতে লাগল; বিশাল প্রস্তরখণ্ড সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হতে লাগল। তারই এক খণ্ড এসে পড়ল এই ত্রিচিনোপলীতে। সেই প্রস্তরখণ্ডই ত্রিচিনোপলীর এই পাহাড়। কৈলাস পর্ব্বতেরই অংশ বলে এর নাম হোলো "দক্ষিণ কৈলাস"।

নামের ত একটা কাহিনী পাওয়া গেল। এখন এই পাহাড়ের উপর অধিষ্ঠিত দেবমূর্ত্তির আগমনের কাহিনী বলছি। শ্রীরামচন্দ্র যখন লঙ্কাজয় করে অযোধ্যায় ফিরে আসেন, তখন বিভীষণও তাঁর সঙ্গে অযোধ্যা দর্শন করতে এসেছিলেন। তিনি যখন স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন শ্রীরামচন্দ্র তাঁকে একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি দেশে নিয়ে যাবার জন্য দেন। শ্রীরামচন্দ্র বিভীষণকে বার বার ব'লে দিয়েছিলেন যে, তিনি যেন এ মূর্ত্তি এক মুহূর্ত্তের জন্যও মাটীতে না নামান, মাটীতে নামালে আর নিয়ে যেতে পারবেন না— মূর্ত্তিটী সেই স্থানেই দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ হবেন। বিভীষণ এ আদেশ প্রতিপালন করতে প্রতিশ্রুত হন। লঙ্কায় আসবার পথে তিনি যখন কাবেরী নদীর তীরে ত্রিচিনোপলীর নিকট উপস্থিত হয়েছেন, তখন তাঁর শৌচে যাবার প্রয়োজন হয়। তিনি দেখতে পেলেন অদূরে এক ব্রাহ্মণ বালক দাঁড়িয়ে আছে। এ বালক আর কেহ নয়, বালকের ছদ্মবেশ ধারণ করে স্বয় বিনায়ক দেব সেখানে গিয়েছিলেন,—অভিপ্রায় বিষ্ণুমূর্ত্তিটি দখল করা। বিভীষণ তখন ব্রাহ্মণ-বালককে ডেকে তার হাতে মূর্ত্তিটী দিয়ে বল্লেন যে, তিনি যতক্ষণ ফিরে না আসেন, ততক্ষণ যেন বালকটী মূর্ত্তি কোলে করে

দাঁড়িয়ে থাকে ; খবরদার, মূর্ত্তিটীকে যেন মাটীতে না বসিয়ে দেয়। বিভীষণ চলে গেলে বিনায়ক দেব একটুও বিলম্ব না করে মূর্ত্তিটী মাটীতে বসিয়ে দিয়ে অন্তর্হিত হলেন ; তিনি জানতেন যে, মূর্ত্তিকে আর কেউ সেখান থেকে সরাতে পারবে না। একটু পরেই বিভীষণ এসে দেখেন, বিষ্ণুমূর্ত্তিটী মাটীতে বসানো রয়েছে, সে ব্রাহ্মণ বালকের খোঁজও নেই। মূর্ত্তি তুলতে গিয়ে দেখেন যে, তিনি অনড়। তখন বিভীষণ ক্রোধান্ধ হয়ে সেই ছদ্মবেশী দেবতা বিনায়কের অনুসন্ধানে গেলেন। বিভীষণ দেবতা না হোলেও ক্ষমতায় দেবতার চাইতে কম ছিলেন না। বিনায়ক তখন ত্রিচিনোপলীর পাহাড়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে গিয়ে লুকিয়েছেন। বিভীষণ খুঁজতে খুঁজতে সেখানে গিয়ে বিনায়ক দেবের মাথায় এক দণ্ডাঘাত করলেন। মাথা ফেটে গেল না বটে, কিন্তু দণ্ডাঘাতের চিহ্ন রইল। এখনও পর্ব্বতের উপর মন্দিরে বিনায়ক দেবের যে মূর্ত্তি রয়েছে, পাণ্ডারা তাঁহার মস্তকে বিভীষণের আঘাতের চিহ্ন দেখিয়ে থাকেন।

বিভীষণ যে মূর্ত্তি লঙ্কায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, তিনি ত আর গেলেন না, সেখানেই থাকলেন। এই স্থান কাবেরী নদীর অপর পারে শ্রীরঙ্গম্। শ্রীরঙ্গমে যে রঙ্গনাথ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন, এবং এখনও যে মূর্ত্তির মহাসমারোহে পূজা হয়, এ সেই মূর্ত্তি।

এইখানে একটু ইতিহাসের কথা বলি। ফরাসীরা যখন ১৭৫১-৫৩ অব্দে ত্রিচিনোপলী অবরোধ করেন, তখন অবরুদ্ধ ইংরাজ সৈন্যদলের নায়ক এই পাহাড়ের উপর দুরবীক্ষণ-যন্ত্র বসিয়ে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহার পরেও এই পর্ব্বত শিরে ইংরেজের পতাকা রাখা হয় এবং সেই যুদ্ধের সময় গোলা গুলি বারুদ প্রভৃতি রাখবার জন্য এই পর্ব্বতের মধ্যস্থ দেবদেবীর কক্ষগুলি ব্যবহৃত হয়। এখনও পর্ব্বত-শীর্ষে একটী ছোট ঘর আছে। শুনলাম, তাহাতে ইংরেজের অস্ত্রাদি আছে। ঘরের দুয়ারে

তালা লাগানো ছিল জন্য, তাহার মধ্যে কি সব অস্ত্র আছে, তা দেখতে পেলাম না।

ত্রিচিনোপলীর ক্রোড়-বাহিনী কাবেরী নদীর উপর যে সেতু আছে, তার উপর দিয়ে অপর পারে মাইল দুই তিন গেলেই শ্রীরঙ্গম্ সহর। সেখানকার বিষ্ণু-মন্দির ও অন্যান্য মন্দিরের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। যে কাবেরী সেতুর কথা বল্লাম, তাহা ১৮৭৬ ফিট লম্বা। ১৮৪৬ অব্দে এই সেতুর নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এখানে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে ড্যাল্টন, কার্কপ্যাট্রিক প্রভৃতি সেনানায়কগণ নগর-রক্ষার জন্য যে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন, সেই ঘটনার স্মৃতি-রক্ষার জন্য এই কাবেরী সেতুর পশ্চিম পার্শ্বের দেওয়ালে একখানি প্রস্তর-ফলকে সেই বীরদিগের নাম ও তাঁদের কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ রয়েছে।

কাবেরী নদীর উপর আর একটী সেতু আছে। তার নাম কোলরুণ সেতু। এই সেতুর নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৮৫২ অব্দে শেষ হয়।

ত্রিচিনোপলীর অন্যান্য দ্রষ্টব্য স্থানের কথা পূর্ব্বেই বলেছি; বিশেষ আর কিছু বল্‌বার নেই।

ত্রিচিনোপলীর কথা আর বলবার না থাক্‌লেও শ্রীরঙ্গমের সম্বন্ধে অনেক কথা বল্‌বার আছে। সে সব কথা বল্‌তে গেলে অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে হয়। আমি সে চেষ্টা করব না, সুধু শ্রীরঙ্গমের একাদশী উৎসবের বিবরণ সম্বন্ধে অতি অল্প দুই-একটী কথা বল্‌ব।

শ্রীরঙ্গমকে একটা দ্বীপ বললেও হয়; কারণ এইখানে কাবেরী নদী দুই শাখায় বিভক্ত হয়ে এক শাখা উত্তর মুখে, আর এক শাখা দক্ষিণ মুখে গিয়েছে; আর শ্রীরঙ্গম্ সহর এই দুইয়ের মাঝে পড়ে একটা দ্বীপের মত রয়েছে।

শ্রীরঙ্গমের প্রধান পর্ব্ব বৈকুণ্ঠ একাদশী। প্রতি মাসে দুইটী একাদশী; তা হলে বছরে চব্বিশটী একাদশী হয়। এই চব্বিশ একাদশীতেই এখানে পূজার বিশেষ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এত তিথি থাক্‌তে একাদশীর দিনই উৎসব হয় এই কারণে যে, একাদশী দেবী এই দিনে রাক্ষসদের হাত থেকে এই স্থানটীকে উদ্ধার করেছিলেন। ব্যাপারটী এই:—মুবাণ নামে এক দৈত্য এক সময়ে চন্দ্রাবতী রাজ্যের রাজা ছিলেন। তিনি ছোটখাটো দেবগণের উপর বড়ই অত্যাচার করতেন। সে সময় বিষ্ণু শয়নে ছিলেন; সুতরাং দেবতাদের আবেদন তাঁর কাছে পৌঁছিত না। কিন্তু তিনি শয়নে থাক্‌লেও ত তাঁর সৃষ্টির লোপ হতে পারে না। তিনি যদিও জাগলেন না, কিন্তু তাঁর দেহ থেকে এক জ্যোতির্ম্ময়ী দেবীর আবির্ভাব হোলো। এই দেবী অসুরদিগকে পরাস্ত করে দেশে শান্তি স্থাপিত করলেন। ব্যাপারটা একাদশীর দিন ঘটেছিল। তখন কৃতজ্ঞ দেবগণ বিষ্ণুর কাছে প্রার্থনা জানালেন যে, তিনি যেন এই দেবীর একাদশী দেবী নামকরণ মঞ্জুর করেন। আর মাসের মধ্যে দুইটি একাদশীতে এই দেবীকেই যেন সকল দেব-দেবীর উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। বিষ্ণু তাতেই সম্মত হলেন। সেই থেকে এখন পর্য্যন্ত এই একাদশী উৎসব হয়ে আস্‌ছে।

এখানকার প্রধান দেবতা শ্রীরঙ্গনাথের কথা পূর্ব্বেই বলেছি। দক্ষিণ অঞ্চলে শিব-দুর্গার মন্দিরই বেশী এবং তাঁদের পূজা-অর্চ্চনাই বিশেষ সমারোহের সঙ্গে সম্পন্ন হয়ে থাকে। কেবল শ্রীরঙ্গমে এবং আরও দুই চারটা স্থানে বিষ্ণুর উপাসনা হয়। আর, কন্‌জিভরমে বা কাঞ্চীতে শিব ও বিষ্ণু দুইয়েরই পৃথক পৃথক পল্লীতে মন্দির আছে। সে কথা পরে যথাস্থানে বল্‌ব। শ্রীরঙ্গমে শিব-মন্দির নেই, তা নয়; কিন্তু শ্রীরঙ্গনাথই শ্রীরঙ্গমের প্রধান উপাস্য দেবতা; এবং তাঁরই নামানুসারে এ স্থানের নাম শ্রীরঙ্গম্ হয়েছে। এখানে রামানুজ সম্প্রদায়ের প্রভাব এক সময়ে খুব বেশী

ছিল, কারণ শ্রীরামানুজাচার্য্য এই শ্রীরঙ্গমের মন্দিরের কর্তৃত্ব-ভার গ্রহণ করেছিলেন। এখনও এখানে ঐ সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি লোপ পায় নাই

৩রা অক্টোবর, ১৭ই আশ্বিন, শনিবার—

প্রাতঃকালে ৬-১১ মিনিটের সময় পাঁচদিনের তীর্থ-ভ্রমণ শেষ করে, বাঙ্গালোর ক্যান্টন্‌মেণ্ট ষ্টেসনে পৌছিলাম। ষ্টেসনে মহারাজের দুইখানি মোটর ছিল; লোকজন উপস্থিত ছিল। আমরা গাড়ী থেকে নেমেই জিনিষপত্র সব ভৃত্যদের জিম্মা করে দিয়ে মোটরে উঠে, কুমারাপার্কে ফিরে এলাম। গরুর গাড়ী বোঝাই হয়ে একটু পরেই মালপত্র এল।

আমরা তাম্বুতে পৌছেই দেখি চা একেবারে টেবিলে প্রস্তুত রয়েছে। তখন হাত-পা ছড়িয়ে ব'সে চায়ের বাটিতে এক চুমুক দিয়ে বল্‌লাম 'আঃ, কি আরাম!'

তীর্থ-ভ্রমণ এক দফা শেষ হয়ে গেল। মহারাজ সেই দিনই আমাদের সকলকে একটী করে ছোট শঙ্খ উপহার দিলেন। আমরা আর তাঁর এই অনুগ্রহের জন্য কি উপহার দিব? আমাদের মত দরিদ্রের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কি আছে? আমরা সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে তাঁকে নীরবে অভিবাদন করলাম। তিনি আমাদিগকে স্নেহালিঙ্গন-বদ্ধ ক'রে তাঁর অপার স্নেহের পরিচয় প্রদান করলেন।

আজ আর বার হওয়া নয়,—একেবারে বিশ্রাম। কিন্তু ভগবান তীর্থ-ভ্রমণের এমন আনন্দ বেশীক্ষণ উপলব্ধি করতে দিলেন না। আমাদের সকলের চিঠি এখানে অপেক্ষা করছিল। শ্রীমান্ ললিত আফিস-ঘরে গিয়েই সব চিঠি বিলি করে দিয়ে নিজের একখানি চিঠি খুলেই দেখে তার সর্ব্বনাশ হোয়ে গিয়েছে। তার কনিষ্ঠ ভাই এগার দিনের জ্বরে টাইফয়েড হয়ে বিজয়ার দিন (রবিবার) রাত্রি ৯টায় প্রাণত্যাগ করেছে।

ললিত একেবারে অধীর হয়ে পড়ল। তখন কোথায় আমাদের বিশ্রাম। সারাদিন ঘোর বিষণ্ণতার মধ্যে কেটে গেল। একবারও কেহ ঘরের বের হলাম না।

৪ঠা অক্টোবর, ১৮ই আশ্বিন, রবিবার—

আজও সারাদিন কোথাও যাই নাই। সন্ধ্যার সময় পদব্রজে মাইল তিনেক ঘুরে আসা গেল। অনেকগুলি পত্র লেখাও হোলো। তীর্থ শেষ করে এসে কেমন যেন একটা অবসাদ আমাদের আচ্ছন্ন করে ফেল্‌ল।

৫ই অক্টোবর, ১৯শে আশ্বিন, সোমবার—

আজ আমাদের দেশে ফিরে যাওয়ার দিন স্থির হোলো। ৯ই অক্টোবর মহারাজ তিনটার গাড়ীতে মহিষুর যাবেন, আমরা রাত ৮-৫০ মেল গাড়ীতে দেশে যাত্রা করব। আমাদের প্রোগ্রাম ঠিক হয়ে গিয়েছে, মহারাজও তাতে সম্মতি দিয়েছেন।

বেলা বারটার সময় একখানি গাড়ী নিয়ে রামেশ্বর ও আমি, রামেশ্বরের এক বন্ধু শ্রীযুক্ত রামস্বামী মুদেলিয়ারের সঙ্গে দেখা করতে ২ নং স্পেন্সার রোডে গিয়েছিলাম। এটা ক্যান্‌টন্‌মেণ্টের কাছে। তিনি বাড়ীতে ছিলেন না, মাদ্রাজ গিয়েছেন। আমরা তখন ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট বাজারে গেলাম। কাপড় ভাল পাওয়া গেল না। সাড়ী সব ১৬ হাত লম্বা, তাও তেমন ভাল নয়। একখানি ছোট চাদর দর করলাম, সাড়ে চার টাকা চায়। আমি সাড়ে তিন টাকা বল্‌লাম, দোকানদার বিক্রয় করল না; অথচ ঐ দরেই আমি ওর চাইতে ভাল চাদর মাদুরায় কিনেছি। সুতরাং কিছুই কেনা হোলো না। তিনটার সময় ক্যান্‌টন্‌মেণ্টের রাস্তাগুলো ঘুরে ঘরে ফিরে এলাম। বিকালে খুব মেঘ দেখে আর বের হলাম না, বৃষ্টি অবশ্য হয় নাই। এ দিনটা পূর্ব্বের দুইদিনের মত অমনিই কেটে গেল।

৬ই অক্টোবর, ২০শে আশ্বিন, মঙ্গলবার—

আজ সকালে আর কোথাও যাওয়া হয় নাই। বেলা আড়াইটার সময় ললিত, রামেশ্বর ও আমি একখানি গাড়ী নিয়ে বের হই। প্রথমে যাই সিটিতে। সেখানে তিনখানা চাদর কিনে নিয়ে, ক্যান্টনমেণ্টে যাই। সেখানে Mysore Industrial Store এ গিয়ে সবাই কিছু কিছু চন্দনের জিনিষ কিনি। আমাদের সামান্য পুঁজি; ভাল ভাল জিনিষের দাম বেশী, তাই সে সব দ্রব্য দেখেই চক্ষু সার্থক করতে হোলো। চন্দন কাঠের যে কত রকম দ্রব্য দেখ্‌লাম, হাতীর দাঁতের যে কত সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর মূর্ত্তি ও অন্যান্য আস্‌বাব দেখ্‌লাম, তা আর বলে উঠা যায় না। রামেশ্বর সাড়ে পাঁচ টাকা দিয়ে হাতীর দাঁতের তৈরী অতি ক্ষুদ্র একটা গণেশ মূর্ত্তি কিনল। আমরা পাখা, ধূপদাপ, আর চন্দন কাঠের সামান্য কিছু কিনলাম। খুব ভাল চন্দনের তৈল ছোট এক শিশি দেড় টাকা দিয়ে কিনলাম।

তার পর সেখান থেকে বেরিয়ে প্রায় সাড়ে পাঁচটার সময় আমরা লালবাগ দেখতে গেলাম। পূর্ব্বেও এক দিন সন্ধ্যার পর গিয়েছিলাম, কিন্তু তখন উদ্যানের গেট বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, ভিতরেও আলো ছিল না, তাই বাগানটী দেখ্‌তে পাই নি। আজ বাগানের মধ্যে গাড়ী নিয়ে প্রবেশ করে, সমস্ত বাগান ঘুরে দেখলাম। এর কাছে কলিকাতার ইডেন উদ্যান কিছুই না। এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এত নানাবিধ গাছপালা, এমন সুন্দর রাস্তা, আর গাছগুলির এমন বাহার, মালীদের এমন শিল্প-নৈপুণ্য আমার চক্ষে পূর্ব্বে কখন পড়ে নাই বললেই হয়। আমরা আর গাড়ীতে থাক্‌তে পারলাম না। এক স্থানে নেমে পড়ে চল্‌তে লাগলাম। বাগানের ঠিক মাঝখানে একটা চক্রাকার উচ্চ বেদীর উপর বর্ত্তমান মহিষুর মহারাজের

পিতার একটী অশ্বারোহী মূর্ত্তি দেখ্‌লাম। মহারাজ বা হাতে ঘোড়ার বল্‌গা ধরে আছেন, ডান হাতে একখানি উলঙ্গ তরবারী ডান কাঁধের উপর ধরেছেন। মূর্ত্তি দেখ্‌লেই বীরের মূর্ত্তি বলে মনে হয়। তার পর চারিদিকে ঘুরে দেখ্‌লাম। এখানে বোধ হয় রাত্রিতে কেউ বেড়াতে পায় না, কারণ এ বাগানের কোথাও বৈদ্যুতিক আলোব বন্দোবস্ত একেবারে নেই। লালবাগ থেকে বেব হয়ে কুমারা পার্কে ফিরে আস্‌তে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল।

৭ই অক্টোবর, ২১শে আশ্বিন, বুধবার—

আজ প্রাতঃকালে বিশ্রাম। দ্বিপ্রহরে আমাদেব কাউকে কিছু না জানিয়ে শ্রীমান রামেশ্বর একেলা কোথায় চলে গেলেন। তিনটার একটু পূর্ব্বে একটা অতি সুন্দর জামার থান কিনে নিয়ে তিনি বাড়ীতে এলেন। থানটী অতি সুন্দর। আমি সেটী তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বল্‌লাম "এখনই চল। সেই মিলে যাই।" শুনেছিলাম, চারটার সময় The Mysore Spinning and Manufacturing Company বন্ধ হয়। তাই আমরা বন-জঙ্গল ভেঙ্গে সোজা রাস্তা ধরে, রেল পার হয়ে মিলের দিকে গেলাম। এটাকে এ-দেশের লোক 'রাজা মিল' বলে, কারণ এটা যদিও লিমিটেড কোম্পানী, কিন্তু বল্‌তে গেলে অধিকাংশ অংশই মহিষুর মহারাজার। এই মিলে বিলাতী সূতার প্রবেশাধিকার নেই। মিলেই সূতা প্রস্তুত হয়, কাপড় বোনা হয়। আমরা তাড়াতাড়ি পাশ নিয়ে মিলে প্রবেশ করলাম এবং সর্ব্বাগ্রে রামেশ্বরের কাছ থেকে যে থান কেড়ে নিয়েছিলাম, সেই রকম একটী থান কিন্‌তে গেলাম। চারিদিকে কলের ঘড়ঘড়ানি। দলে দলে লোক কাজ করছে। আমরা বরাবর গুদামে গেলাম। সেখানে প্রধান কর্ম্মচারীর অনুমতি

নিয়ে প্রকাণ্ড গুদামে প্রবেশ করে নানা রকম কাপড় দেখ্‌তে লাগ্‌লাম। যা দেখি, তাই কিন্‌তে ইচ্ছা করে। একটা ছিট আমি পছন্দ করলাম। কিন্তু গুদামের কর্ত্তৃপক্ষ বল্‌লেন, সেটা নূতন প্যাটার্ণ, এখনও বাজারে বের হয় নাই; সুতরাং সেটা দিতে পারবেন না। তখন আর একটা ছিট পছন্দ করলাম। রামেশ্বর সেই আগের থান একটা নিল। আমি সেই এক থান ছিট, এক জোড়া কাপড় ও গামছা ঠিক করলাম। কিন্তু গুদামের লোকেরা দাম বল্‌তে পারল না। আমরা যা যা কিনব বলে পছন্দ করলাম, একজন কর্ম্মচারী তার একটা লিষ্ট করে, জিনিষের নম্বর দিয়ে সেই লিষ্ট নিয়ে আমাদের আফিসে যেতে বল্‌ল। আমরা সেই তালিকা নিয়ে একটু দূরে আফিসে গেলাম। সেখানকার কর্ম্মচারীরা তাই দেখে তিনখানি বিল প্রস্তুত করল; একখানি আমরা পাব, একখানি গুদামওয়ালা রাখবে, আর একখানি গেটের কর্ম্মচারী নিয়ে মাল মিলিয়ে দেখে আমাদের ছেড়ে দেবে। এই সব করতে পাঁচটা বেজে গেল। কর্ম্মচারীরা বল্‌ল, গুদাম যদিও পাঁচটায় বন্ধ হবে, তা হলেও আমাদের মাল পাওয়া যাবে। সেখানেই টাকা হিসাব করে দিতে হোলো। রামেশ্বর সেই তিনখানি বিল নিয়ে আবার সেই গুদামে গেল। সেখানে তারা বল্‌ল, একটা জিনিষের নম্বর ভুল হয়েছে। তখন রামেশ্বর আবার ছুটে আফিসে এল, তারা পুনরায় সেটা সংশোধন করে দিল। রামেশ্বর আবার সেই গুদামে গেল। তখন মাল পাওয়া গেল। তারপর গেটে এলে তারা একখানি রসিদ নিয়ে মাল পরীক্ষা করে ছেড়ে দিল। অতি পাকা ব্যবস্থা। আমরা মিল থেকে জিনিষ কেনায় দরে সস্তায় পেলাম।

আমাদের বাসা থেকে মিল প্রায় দুই মাইল। আমরা যাবার সময় বন-জঙ্গল ভেঙ্গে গিয়েছিলাম, এখন আসবার সময় আকাশে ঘোর

মেঘ, বৃষ্টি একটু একটু পড়তে আরম্ভ করেছে। অনেক কষ্টে (এখানে সব স্থানে গাড়ী মেলে না) একখানি ঝট্‌কা ভাড়া করে ভিজতে-ভিজতে বাসায় এলাম।

৮ই অক্টোবর, ২২শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—

আমাদের ফিরবার সময় যে-যে স্থান দেখে যেতে হবে, তার একটা প্রোগ্রাম তৈরী করা হয়েছিল, এখানে সেটা লিপিবদ্ধ করছি—

শুক্রবার, ৯ই অক্টোবর, বাঙ্গালোব ত্যাগ রাত্রি ৮-৫০ মিনিটে, (৮নং বাঙ্গলোর মেলে)।

শনিবার, ১০ই অক্টোবর, আর্কোনাম জংসন প্রত্যুষে ৪-১৫ মিনিটে

" " আর্কোনাম ত্যাগ প্রাতে ৬-২৫ মিনিটে (৩৬ নং ডাউন প্যাসেঞ্জারে)

" " চিঙ্গলীপুট পূর্ব্বাহ্ণ ৮-২৫ মিনিটে

" " চিঙ্গলীপুট ত্যাগ " ৯ টায় (মোটর বাসে)

" " পক্ষীতীর্থে উপস্থিতি ১০ টায়

" " পক্ষীতীর্থ ত্যাগ মধ্যাহ্ণ ১ টায় (মোটর বাসে) বা অপরাহ্ণ ৩টায় (মোটর বাসে)

" " চিঙ্গলীপুট মধ্যাহ্ন ১-৫০ অথবা ৪ টায় (মোটর বাসে)

" " চিঙ্গলীপুট ত্যাগ মধ্যাহ্ণ ২ টায় (২৫১ নং আপ্ গাড়ীতে) অথবা সন্ধ্যা ৬-৩৫ (৪১ নং আপ প্যাসেঞ্জারে)

" " কন্‌জিভরমে উপস্থিতি অপরাহ্ণ ৩-১৪ অথবা সন্ধ্যা ৭-৪৮ মিনিটে

রবিবার, ১১ই অক্টোবর কনজিভরম্ ত্যাগ পূর্ব্বাহ্ণ ১১-৫৪ মিনিটে

(৩৭ নং আপ প্যাসেঞ্জারে)

” ” আর্কোনাম ১-৬ মিনিটে

” ” আর্কোনাম ত্যাগ ১-২৭ মিনিটে

(৪২ নং বাঙ্গালোর একস্‌প্রেসে)

” ” মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেসন ২-২০ মিনিটে

সোমবার, ১২ই অক্টোবর মাদ্রাজ ত্যাগ, রাত্রি ৮ টায় (কলিকাতা মেলে)।

বুধবার, ১৪ই অক্টোবর হাবড়া উপস্থিতি ১২-৪৪ মিনিটে।

এই প্রোগ্রামে মহাবলীপুরমের নাম নেই ; কারণ সেখানে যাবার কোন ট্রেণ নেই। এক, মাদ্রাজ থেকে ৪০ মাইল মোটর ভাড়া করে যেতে-আস্‌তে হয়, ব্যয় পঞ্চাশ টাকা ; আর এক চিঙ্গলীপুট থেকে ২০ মাইল। যদি চিঙ্গলীপুট থেকে বাস যাতায়াত থাকে, তা হলে যাওয়া হবে এবং তা হলে একদিন পিছিয়ে যাবে, বৃহস্পতিবারে কলিকাতায় পৌছুতে হবে। নতুবা যা প্রোগ্রাম আছে তাই।

আর একটা কথা আছে। অনেক সময় পক্ষীতীর্থ থেকে মোটর-বাস বরাবর কন্‌জিভরমে যায়। যদি সেটা পাই, তা হলে আর চিঙ্গলীপুটে ফিরে আস্‌তে হবে না, ঐ পথেই কন্‌জিভরমে যাব। তাতে সুবিধা হবে।

আরও একটা কথা আছে। পক্ষীতীর্থে গিয়ে ৩০০ সিঁড়ি ভেঙ্গে পাহাড়ের উপর উঠতে হবে। সেখানে ত মহারাজ সঙ্গে থাকবেন না, থাক্‌ব আমরা দুই জন—রামেশ্বর আর আমি ; কাজেই কে আমাদের জন্য আগে থাক্‌তে দোলা বা চৌকীর ব্যবস্থা করে রাখবে। এখান থেকে টেলিগ্রাম করে সে ব্যবস্থা করতে গেলে পনর-কুড়ি টাকা ব্যয় ; শ্রীযুক্ত

মহারাজাধিরাজ বাহাদুর তাতেই সম্মত, কিন্তু, আমাদের জন্য তাঁর যথেষ্ট ব্যয়ও হয়েছে, আর তাঁকে বৃথা অর্থব্যয় করতে দেব না, সুতরাং পক্ষীতীর্থের পাহাড়ে হেঁটে উঠবার দুঃসাহস করতেই হবে। সেখান

স্বর্ণ-মন্দির—শ্রীরঙ্গম্
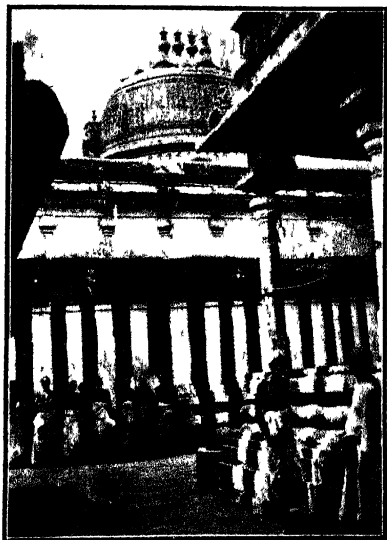
থেকে নামতে যদি দেরী হয়, তা হলে একটায় যে বাস ছাড়ে, তা ধরতে পারব না, দুইটায় যেটা ছাড়ে, তাই ধরতে হবে। সেইজন্য প্রোগ্রামে

'অথবা' দিয়ে গাড়ীর কথা বলা হয়েছে। আগের 'বাসে' আসতে পারলে সুবিধা এই হবে, যে আমরা কন্‌জিভরমে অপরাহ্ণ ৩—১৫ মিনিটে পৌঁছিতে পারব এবং আশ্রয়স্থান ঠিক করে ঐ অপরাহ্ণেই কিছু দেখেও নিতে পারব। পরের ট্রেণে এলে রাত আটটায় অজ্ঞাত স্থানে নামতে হবে এবং পরদিন তাড়াতাড়ি সকাল বেলায় সব দেখে ১১—৫৬ মিনিটের ট্রেণে বেরুতে হবে।

তার পর, ভয় হোলো পক্ষীতীর্থে গিয়ে তিন শত সিঁড়ি উঠ্‌তে-নামতে পারব ত। বিশেষ সাড়ে এগারটার সময় পাহাড়ের মাথায় উঠ্‌তেই হবে, কারণ সাড়ে এগারটা থেকে বারটার মধ্যে পক্ষী আসেন। পক্ষীর আগমন দেখেই তিন শত সিঁড়ি এক ঘণ্টার মধ্যে নেমে একটার 'বাস' ধরতে পারলে সব দিকে সুবিধা। দেখি কি হয়। আর যদি পক্ষীতীর্থ থেকে কন্‌জিভরমের বাস থাকে, তা হলে বোধ হয় একটু ধীরে সিঁড়ি নামলেও চল্‌বে। সেখানে না গেলে কিছুই ঠিক হচ্চে না।

এইদিন বিকালে একখানি গাড়ী নিয়ে পথে পথে বেড়িয়ে এলাম। মহিসুর মহারাজার প্রাসাদ দেখতে গিয়েছিলাম। বাইরে থেকে দেখে এলাম, কারণ পাশ না হলে ভিতরে যেতে দেয় না।

রাত প্রায় নয়টার সময় মহারাজ আমাকে ডেকে পাঠালেন। এত রাত্রে এমন কি দরকার, বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি গেলাম। মহারাজ আমাদের দেশে ফিরবার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। মাদ্রাজে পৌঁছে যেন টেলিগ্রাফ করি, কলিকাতায় পৌছেও যেন টেলিগ্রাফ করি; রাস্তায় যেন খুব সাবধানে যাই, রাস্তায় যেন কোথাও জল না খাই, সোডা লিমনেড খাই, মাদ্রাজী রান্না যেন না খাই, ভাল হোটেলে যেন থাকি, ইত্যাদি ইত্যাদি। পরমাত্মীয় ব্যতীত এমন উদ্বিগ্ন হয়ে উপদেশ কেউ কাউকে দেন না।

৯ই অক্টোবর, ২৩শে আশ্বিন, শুক্রবার—

আজ আমাদের যাত্রার দিন। সকালে উঠেই রামেশ্বর আমাদের বাক্স-বিছানা নিয়ে ষ্টেসনে গেলেন। আমরা স্মুধু রাখলাম দুইজনের দুইটা ছোট সুট-কেস, আর সামান্য বিছানা। অন্য যা কিছু, সব এখনই কলিকাতায় পাঠিয়ে দেওয়ার জন্য রামেশ্বর সিটি ষ্টেসনে গেলেন। পথে অত বোঝা নিয়ে নানা স্থানে নামা-উঠা অসম্ভব হয়ে পড়ত।

মহারাজ ছেলেমেয়েদের নিয়ে আজ অপরাহ্ন তিনটার গাড়ীতে মহিষুর যাবেন। সোমবার এগারটায় ফিরবেন। ললিত ও ডাক্তার সঙ্গে যাবে। একদল চাকর জিনিষপত্র নিয়ে সকাল সাতটার গাড়ী ধরে মহিষুর যাবার জন্য ষ্টেসনে গেল। আমাদের গাড়ী রাত ৮-৫০। পূর্ব্বদিনই আর্কোনাম পর্য্যন্ত আমাদের দুইটা দ্বিতীয় শ্রেণীর বার্থ রিজার্ভ হয়ে গিয়েছিল।

তিনটার সময় মহারাজ পুত্রকন্যা, ললিত ও ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে মহিষুরে গেলেন। আমরা আটটার সময় ষ্টেসনে গেলাম। সঙ্গে দুইজনের দুইটা সুট-কেস আর অতি সামান্য বিছানা। রাজবাড়ী থেকে যথেষ্ট খাবার সঙ্গে এসেছে।

৮-৫০ মিনিটে গাড়ী ছাড়ল। নিশ্চিন্তে ঘুমাবার যো নাই (গাড়ীতে যদিও আমরা দুইজন, কারণ ৪-১৫ মিনিটে আর্কোনাম জংসনে নামতে হবে। ৪-১৫ ভোরে আর্কোনামে নামলাম।

১০ই অক্টোবর, ২৪শে আশ্বিন, শনিবার—

আর্কোনাম জংসনে যখন নামিলাম, তখন রাত একটু আছে। রেলের সেতু পার হ'য়ে চিঙ্গলীপুটের গাড়ীতে বস্‌লাম। গাড়ীতে মোটে আলো নেই। সঙ্গে বাতি ছিল, তাই জ্বেলে গাড়ী আলোকিত করলাম এবং গাড়ী ছাড়িবার পূর্ব্বেই প্রাতঃকৃত্য শেষ করে নেওয়া গেল।

আর্কোনাম থেকে চিঙ্গলীপুটের দুইখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কিনলাম ; প্রত্যেক খানির দাম আড়াই টাকা। গাড়ীর মধ্যেই স্নান করে নিলাম ; এবং আটটার সময়ই, সঙ্গে যা খাবার ছিল, তাহার কিছু খেয়ে নিলাম ; কি জানি পথে যদি কিছু না মেলে, তাই ভবিষ্যতের জন্য সামান্য খাবার রেখে দিলাম।

আর্কোনাম থেকে ট্রেণ ছাড়ল ৬-১৫ ; চিঙ্গলীপুট পৌছিবে ৮-২৫। ন'টার সময়ই পক্ষীতীর্থের বাস ছাড়বে। চিঙ্গলীপুটে যথাসময়ে পৌছিয়া জিনিষপত্র বাসের মাথার উপর দিয়ে প্রত্যেকে ছয় আনার টিকিট করে বাসে উঠ্‌লাম। তাড়াতাড়ি এসেছিলাম বলে বাসে স্থান পেলাম। এক বেঞ্চে চার জনের স্থলে ছয় জন বস্‌লাম। ঠিক ৯টায় বাস ছাড়ল। রাস্তা অতি সুন্দর, গাড়ীও ভাল, মোটেই ঝাঁকানি লাগল না। সঙ্গে যাঁরা যাচ্ছিলেন, তাঁদের অনেকেই পক্ষীতীর্থের যাত্রী। তাঁরা এই তীর্থ সম্বন্ধে অনেক গল্প করতে লাগলেন। আমরা যে পক্ষীতীর্থ দশন করে অনায়াসে বেলা একটার 'বাস' ধরে চিঙ্গলীপুটে আস্‌তে পারব, সে ভরসাও তাঁরা দিলেন। তবে যদি পাখীর আগমনে বিলম্ব হয়, তা হোলে হয় ত আমরা একটার বাস ধরতে পারব না, তিনটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যা হয় হবে, এখন ত পৌছানো যাক্।

পক্ষীতীর্থ

পক্ষীতীর্থ পাহাড়ের নাম। পাহাড়ের পাদদেশে যে গ্রাম, তাহার নাম তিরুপালীকুন্দ্রম্। দূর হইতে পাহাড়ের উপর মন্দির দেখ্‌লাম। ৪৫ মিনিটে চিঙ্গলীপুট থেকে পক্ষীতীর্থে বাস পৌছিল। রাস্তা মোটে ৯ মাইল। যেমন গরম, তেমনি ধূলা। আমার ভয় হয়েছিল, এই রৌদ্রে এমন গরমে সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে উঠতে পারব কি না। সিঁড়িও কম নয়। আগে শুনেছিলাম তিনশত সিঁড়ি, এখানে শুন্‌লাম ৫৬০। যাক্, বাস থেকে নামতেই একটা ছোকরা কুলী পাওয়া গেল। আমরা পূর্ব্বে স্থির করেছিলাম জিনিষপত্র বাসের মাথাতেই রাখব, নামাব না। কিন্তু বাসওয়ালা তখনই চিঙ্গলীপুট চলে যাবে। একটার সময় আমরা যে বাসে চিঙ্গলীপুট ফিরব, তখন এখানিও আস্‌তে পারে, অপর একখানি আছে, সেও আস্‌তে পারে। এ অবস্থায় সেই বাসের মাথায় জিনিষ রাখা নিরাপদ নয়। আরও কারণ এই যে, যে বাস পক্ষীতীর্থ থেকে একটার সময় ছাড়বে, সে একটা-পঞ্চাশ মিনিটে চিঙ্গলীপুট পৌছিবে। আমাদের ট্রেণ দুইটার ঠিক দশ মিনিট পরে ছাড়বে। ঐ ট্রেণ ধরতে না পারলে পরের ট্রেণ ধর্‌তে হবে সন্ধ্যা ৬-৩৫। তাতে অসুবিধা এই যে কন্‌জীভরমে ৭-৪৮ পৌছিতে হবে। অজানা স্থানে রাত্রিতে পৌছান। যাক্, শেষে কুলী বালক বল্‌ল যে, যেখান থেকে পাহাড়ের সিঁড়ি আরম্ভ, তাহারই পাশে একটা বড় বাড়ী আছে; তাতে ছোট ছোট অনেক ঘর আছে। আট আনা ভাড়া দিলে তাহারই একটী ঘরে জিনিষ রেখে তালা বন্ধ করে গেলেই হবে। সেই ভাল মনে করে

আমরা সেই বাড়ীতে গেলাম। গৃহস্বামী বাড়ীতে ছিলেন না, গৃহিণী ও বালক ভৃত্য সমস্ত ব্যবস্থা করে দিলেন। জিনিষপত্র ও বিছানা সেখানেই রাখলাম।

ইতিমধ্যে আর একজন লোক এসে বলল পাহাড়ে উঠবার জন্য সে ডুলি দিতে পারে। ভারি আনন্দ হল। প্রত্যেক ডুলি যাতায়াতে দুই টাকা চাইল। তাইতেই স্বীকার হলাম।

দুইখানি ডুলি এলো। প্রত্যেকখানিতে দুইজন কুলী। ত্রিচিনোপলীর গণেশ পাহাড়ে কিন্তু প্রত্যেকের জন্য ৮জন কুলী বাহক ছিল। ডুলির কাঠের ফ্রেম, দড়ির ছাউনি, দুপাশে দড়ির ঝোলনা, তারই মধ্যে বাঁশ দিয়ে দুজনে কাঁধে করল। এতটা সিঁড়ি সেই রৌদ্রে উঠতে পথের মধ্যে সুধু একবার তারা থেমেছিল।

উপরে উঠে প্রথমে মন্দিরে গেলাম। যাবার সময় নীচের থেকে পূজার উপকরণ ও ফুল কিনে নিয়ে গিয়েছিলাম।

মন্দিরের দেবীর নাম ত্রিপুরাসুন্দরী। সেখানে পূজা দিয়ে প্রসাদ নিয়ে আমরা তাড়াতাড়ি মন্দিরের পাশেই যে স্থান একেবারে গাছপালাশূন্য, সেখানে গেলাম। পাহাড়ের একটু নীচেই কয়েকটী গাছ আছে, আর একটা চালা বাঁধা আছে। সেখান থেকে পক্ষীর আগমন ও আহার বেশ দেখতে পাওয়া যায়। সেই পাহাড়ের পাশেই একটা অল্প পরিসর স্থানে জল আছে। সেই জলে নাকি রোজ পক্ষী দুইটী কোন্ সময়ে এসে স্নান করে যায়, এই প্রবাদ। কেহ কিন্তু কোন দিন স্নানের সময় তাদের দেখে নাই। আমরা একটা গাছের তলায় পাথরের উপর বসে রইলাম। শুনলাম এগারটার পর একজন পুরোহিত উপরের মন্দিরের পূজা শেষ করে পক্ষীর জন্য খাদ্য নিয়ে আসবেন। তারপর মন্ত্রপাঠ করে আহ্বান করলে পক্ষী দুইটী আসবে।

প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকবার পর একজন লোক এসে একখানি কাঠের পিঁড়ি, যেখানে পক্ষী এসে আহার করবে, সেইখানে রেখে গেল এবং একটা ঢাকা পাত্রে খাদ্যও রেখে গেল। শেষে দেখলাম সেগুলি মিষ্ট
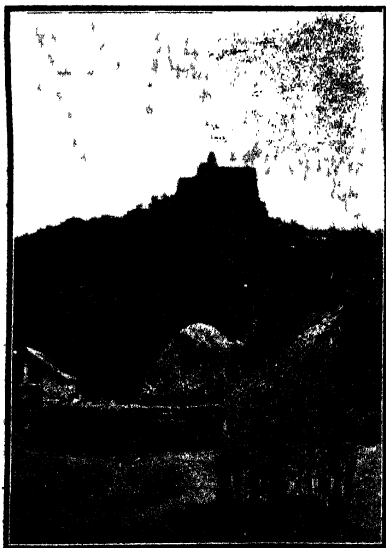
পক্ষীতীর্থ—পাহাড় ও মন্দির

পোলাও বা ঘি-ভাত। একটু পরেই পুষ্টদেহ, মুণ্ডিত-মস্তক পুরোহিত এলেন। তিনি বোধ হয় পূর্ব্বেই মন্দিরের মধ্যে আমাদের কথা শুনেছিলেন। তিনি এসেই আমাকে ডাক্‌লেন এবং আমার নামেই সঙ্কল্প করে

আজ পক্ষীকে আহ্বান করবেন বল্লেন। আমার নাম গোত্র প্রভৃ
উচ্চারণ করে আমার দ্বারা সঙ্কল্প করালেন। সুতরাং তিনটী টাকা দক্ষি
দিতে হোলো। তাহার পর আমি নেমে এসে নীচে একটা বৃক্ষতে
উপবেশন করলাম। যাত্রীও অনেক এসেছিল; পুরোহিত সকলকে
উপবেশন করতে বল্লেন, কেহই দাঁড়িয়ে থাকল না।

তখন পুরোহিত দাঁড়িয়ে উত্তর পূর্ব্ব পশ্চিম দক্ষিণ চারিদিকে মুখ ক
যোড়-হস্তে পক্ষীকে আহ্বান করে সেই পিঁড়ির উপর উপবেশন কর্লে
এবং জপ করতে আরম্ভ করলেন। মধ্যে মধ্যে আকাশপথে চেয়েও দেখতে
লাগলেন। আমাদের দৃষ্টিও আকাশের দিকে ছিল। পাখী আসবা
সময় আসন্ন দেখে পুরোহিত মহাশয় আমাকে ডেকে নিয়ে তাঁর আসনে
পাশে বসালেন। আমার দেখ্বার সুবিধা আরও বেশী হোলো।

কিছুক্ষণ পরে দেখ্লাম, দূর সমুদ্রের দিক থেকে কি যেন একা
আস্‌ছে। তখনও সেটা যে পাখী, তা বুঝতে পারা গেল না। সেদিকে
পাহাড় বা অরণ্য কিছুই নাই—সুধু মাঠ। একটু পরেই দেখ্লাম সে
দূর-দৃষ্ট বস্তুটী একটী পাখী। পাখীটি উড়ে এসে পুরোহিতের অনতিদূরে
বস্‌ল। সে যে মন্দির বা পাশের জঙ্গল থেকে আসে নাই, তা আমর
বিশেষ সতর্ক দৃষ্টিতেই দেখেছিলাম। পাখীটী এসে বসেই থাকল, নড়
না। তখন দূর পশ্চিম দিক থেকে আর একটী পাখী আস্‌ছে দেখা গেল
সেটীও এসে পূর্ব্বটীর পার্শ্বে বস্‌ল। পুরোহিত তখন দুইটী বাটিতে
খাদ্য পরিবেশন করে দিলেন। পাখী-দুইটী ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে আহা
করতে লাগল। তারা একেবারে পুরোহিতের সম্মুখে এল। পুরোহিত
মধ্যে মধ্যে হাতে করে তাদের মুখে খাদ্য তুলে দিতে লাগলেন। পাখী দুইটি
শ্বেতকায় শকুনি; বাচ্চা নয়, বয়স বেশী হয়েছে। সাধারণ শকুনি হইতে
আকারেও বড়।

পক্ষীতীর্থ—পক্ষীর সেবা

পাঁচ ছয় মিনিটের মধ্যেই আহার শেষ হয়ে গেল। পক্ষী দুইটী দূর সমুদ্রের দিকে চলে গেল। পুরোহিত বললেন, ইহারা দুইজন দেবতা, অগস্ত্য মুনির সন্তান। একজন রামেশ্বরে থাকেন, আর একজন গঙ্গোত্রীতে থাকেন। এখানে কোন্ সময় এসে পার্শ্বস্থ কুণ্ডে স্নান করেন, তাহা কেহ বল্‌তে পারে না। তার পর এই সময়ে এসে আহার

করে যান। কোন কোন দিন নাকি পুরোহিতকে অনেকক্ষণ বসে জপ করতে হয়; পাখীর আসতে বিলম্ব হয়। আজ সকাল-সকালই এসেছেন।

পাখী দুইটী দূর সমুদ্রের দিকে উড়ে গেল, আমরা তাড়াতাড়ি এসে দোলায় বসলাম। তখন ১২টা বেজে গেছে। নীচে এসে ডুলিওয়ালাদের ৪৲ টাকা ও ঘরভাড়া ॥০ দিলাম। সেখান থেকে বা চিঙ্গলীপুট থেকে মহাবলীপুরমে যাবার মোটর বাস নাই, যেতে হলে ঝটকায় যেতে হয়। পক্ষীতীর্থ থেকে মহাবলীপুরম্ ৯ মাইল। একটু বিশ্রাম করে, ঝটকা ঠিক করে মহাবলীপুরম্ গিয়ে সমস্ত দেখে পুনরায় এখানে ফিরে আসতে রাত হয়ে যাবে। পথে হিংস্র জন্তুরও ভয় আছে। এখানে রাত্রিতে 'বাস' চলে না, শেষ 'বাস' ৫টায় চিঙ্গলীপুট চলে যাবে। এখানে থাকবার বিশেষ সুবিধা নাই। বাড়ীওয়ালা জিনিষ রাখবার জন্য যে ঘর দিয়েছিল, সে ত অন্ধকূপ। বাড়ীর গৃহিণী বললেন, আর ভাল ঘর নাই। যদি থাকতে হয় তা হলে তাঁহার গৃহের অনাবৃত বারান্দায় রাত্রিবাস করতে হবে। হোটেল নাই, সুতরাং হয় বেঁধে খেতে হবে, আর না হয় অনা ব থাকতে হবে। কাজেই মহাবলীপুরম্ দেখবার সাধ জন্মের ম ত্যাগ করে চিঙ্গলীপুট ফিরবার জন্য যেখানে বাস দাঁড়ায়, সেখানে গেলাম। দেখলাম বাস দাঁড়িয়ে আছে। তখন পৌনে একটা, আরও ১৫ মিনিট পরে বাস ছাড়বে। দুইটা বাজতে ৭ মিনিট থাকতে বাস চিঙ্গলীপুট ষ্টেসনে পৌছল। আমরা তাড়াতাড়ি ষ্টেসনে গেলাম। আমি জিনিষপত্র নিয়ে গাড়ীর দিকে গেলাম, রামেশ্বর কন্‌জীভরমের দুইখানি টিকিট কিনে আনতে গেল। একটু পরেই গাড়ী ছেড়ে দিল।

ঠিক দুইটার সময় গাড়ী ছাড়ল। তখন হাত-মুখ মাথা ধুয়ে টিফিন বাস্কেটে যাহা কিছু খাদ্য অবশিষ্ট ছিল, তাই দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি করলাম। চিঙ্গলীপুটে ত কিছু সংগ্রহ করবার সময় পেলাম না।

কন্‌জিভরম্ বা কাঞ্চী

তিনটা পনর মিনিটের সময় কন্‌জিভরম্ ষ্টেসনে গাড়ী এল। চিঙ্গলীপুট যাবার সময় এখান হয়ে গিয়েছিলাম, নামা হয় নাই। ষ্টেসনে ঝট্‌কা ছাড়া অন্য যান নাই। তাই একখানি ভাড়া করে সহরের যেটা সব চেয়ে ভাল হিন্দু-হোটেল, সেখানে নিয়ে যেতে বল্‌লাম।

ষ্টেসন থেকে প্রায় দুই মাইল গিয়ে একটা একতালা বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী থামল। বাড়ীর গায়ে সাইন-বোর্ডে লেখা আছে হিন্দু রেস্তোঁরা। রামেশ্বর দেখে এল, একেবারে বাসের অযোগ্য, অথচ নামের জাঁক খুব। বিশেষ তারা মাদ্রাজী আহার দিতে পারে, ভাল থাকবার স্থান দিতে পারে না।

তখন কি করা যায় ভাবছি, এমন সময় তিলক-কাটা একজন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর বয়সের পাণ্ডা নিজেই একখানি গো-বাহিত ঝট্‌কা চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তিনি বল্‌লেন যে, তিনি বিষ্ণু-কাঞ্চীর পাণ্ডা। বিষ্ণু-কাঞ্চীর মন্দিরের নিকটেই তাঁর বাড়ী। তিনি তাঁর বাড়ীতে আমাদের স্থান দিতে পারেন এবং বিষ্ণু-কাঞ্চীর পূজা ও দর্শনের ভার নিতে পারেন। আমরা তাতেই সম্মত হলাম।

এ স্থান থেকে প্রায় দুই মাইল গিয়ে তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। বাড়ীর বাইরে একটী আচ্ছাদনওয়ালা বারান্দা, তাহার পর একটী ঘর; ভিতরে অন্ধকার। পাণ্ডারা দুই ভাই। ছোট ভাই মাদ্রাজে না কোথায় গিয়েছেন, তাঁর স্ত্রীও বাপের বাড়ীতে। বাড়ীতে আছেন এই পাণ্ডা, তাঁর মা, আর তাঁর সুন্দরী যুবতী স্ত্রী (শুন্‌লাম দ্বিতীয় পক্ষ)। তিনি

অনাবৃত মস্তকে আমাদের সম্মুখে এলেন, মাও এলেন। সম্পূর্ণ অপরিচিত পুরুষের সম্মুখে আসতে এঁরা একটুও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করলেন না।

আমরা পাণ্ডার বাড়ীতে কূপে স্নান করে নিলাম। বিষ্ণুর ভোগের জন্য পাঁচ টাকা দিলাম। ভোগ হয়ে গেলে খিচুড়ী প্রসাদ আসবে, তাই আহার করতে হবে। পাণ্ডা বাড়ীতে কিছু চাট্‌নী প্রস্তুত করে দেবে।

আমরা তখন বিষ্ণু-মন্দির দেখতে গেলাম। বরদারাজের মন্দির ও অন্যান্য মন্দিব দেখে সন্ধ্যার পর পাণ্ডার বাড়ীতে ফিরলাম। এখানে যেমন ভয়ানক গরম, আর তেমনি মশা। সামান্য বিছানা সঙ্গে, মশারি আগেই কলিকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছি। প্রায় ৯টার সময় প্রসাদ এল। স্রেফ খিচুড়ী, আর কিচ্ছু না। খিচুড়ী বেশ ভাল। পাণ্ডা যে চাট্‌নী দিল, কার সাধ্য তা মুখে দেয়, এমন ঝাল। কি করা যায়, তাই খাওয়া গেল। তার পর ঘরের মধ্যে বিছানা পেতে রামেশ্বর শয়ন করলেন, আমি বারান্দায় বিছানা পাতলাম; কিন্তু মশা আর গরম একেবারে অতিষ্ঠ করে তুল্‌ল। সৌভাগ্যক্রমে রাত্রিতে খুব বৃষ্টি এল। আমি যেখানে ছিলাম, সেখানে জল লাগ্‌ল না, সুতরাং সেখানেই থাকলাম। এখানেও বোধ হোলো ব্যভিচারের স্রোত আছে। পাণ্ডার বাড়ীতে রামেশ্বরপ্রসাদ তার একটু বিশেষ আভাস পেয়েছিলেন। মহারাজের সঙ্গে যেখানে-যেখানে গিয়েছি, সেখানে কিছুই নজরে পড়ে নাই; সমারোহে ও আড়ম্বরে সব অদৃশ্য হ'য়েছিল; এমন কি, এক মাদুরা ছাড়া আর কোথাও দেবদাসীদেরও দর্শন লাভ হয় নাই। এখানে আমরা সাধারণ তীর্থযাত্রী; তাই এ-সব নজরে পড়ল। যাক্‌, অনিদ্রায় রাত্রি কেটে গেল।

১১ই অক্টোবর, ২৫শে আশ্বিন, রবিবার—

আজ পূর্ব্বাহ্ণ ১১-৫৪ মিনিটের ট্রেণে আমরা কন্‌জিভরম ত্যাগ করে মাদ্রাজে যাব। প্রাতঃকালে উঠেই ওখান থেকে তিন মাইল দূরে শিব-কাঞ্চী

দেখ্‌তে যাব, স্থির করেছিলাম। এবার আর সঙ্গে পাণ্ডাকে নিলাম না। সে অসংখ্য মূর্ত্তি দেখাবে, আর পয়সা আদায় করবে, তা আর হতে দিচ্ছিনে। পূর্ব্বদিন যে ঝট্‌কাওয়ালা আমাদের ষ্টেসন থেকে পাণ্ডার

শিব-কাঞ্চী মন্দিরের সম্মুখভাগ—কন্‌জিভরম্‌

বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল, তাকেই আজ খুব সকালে আস্‌তে বলে দিয়েছিলাম। সে যথাসময়ে উপস্থিত হোলো। সেই আমাদের শিব-কাঞ্চীর

মন্দিরের সমস্ত দেব-দেবী দর্শন করিয়ে যথাসময়ে ষ্টেসনে পৌঁছিয়ে দেবে বল্‌ল। শিব-কাঞ্চীতে তেমন সমারোহ দেখলাম না; লোকজনও কম। আমরা যখন পৌঁছিলাম, তখন বেলা আটটা; তখনও মূল মন্দিরের দুয়ার খোলা হয় নাই। আমরা গেলে তবে পুরোহিত এসে দ্বার খুল্‌ল। আমরা পূজা করে দক্ষিণা দিয়ে অন্যান্য কয়েকটী মন্দির দেখে প্রণামী দিয়ে বাইরে এলাম। তার পর কামাখ্যা দেবীর মন্দির (শিবমন্দির হতে দূরে) দেখ্‌তে গেলাম। সেখানেও প্রণামী দিয়ে তীর্থ ও দেবদেবী দর্শন এবার-কার মত শেষ করলাম।

ষ্টেসনে যখন এলাম, তখন বেলা প্রায় দশটা; ১১—৫৫ মিনিটে আমা-দের গাড়ী। দ্বিতীয়-শ্রেণীর বিশ্রাম-গৃহে জিনিষ-পত্র রেখে স্নানাদি শেষ করলাম। কলে স্নান করে শরীর বড়ই সুস্থ বোধ হোলো; পূর্ব্ব রাত্রির কষ্ট দূর হোলো। গাড়ীর বিলম্ব আছে দেখে রামেশ্বর একখানি ঝট্‌কা নিয়ে আহার্য্যের সন্ধানে গেল; এবং কিছুক্ষণ পরে তার টিফিন-কেরিয়ার বোঝাই করে ভাত ডাল তরকারী অম্বল আন্‌ল। ভাত ছাড়া সবই অখাদ্য। যাক্, তাই পরম পরিতোষ সহকারে আহার করে নিলাম। আগের দিন সহরের মধ্যে না গিয়ে আমরা যদি ষ্টেসনের বিশ্রাম-কক্ষেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করতাম এবং ষ্টেসনের একটী লোককে পথি-প্রদর্শক করে মন্দিরাদি দেখ্‌তাম, তা হলে এত কষ্টও হোতো না, অকারণ অনেকগুলি টাকা দণ্ডও দিতে হোতো না।

১১—৫৪ মিনিটে গাড়ী এল। আর্কোনাম জংসনের দুখানি টিকিট নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লাম। ১—৫ মিনিটে আর্কোনাম জংসনে গাড়ী পৌঁছিল। সে গাড়ী ছেড়ে অপর প্ল্যাটফরমে যাবার একটু পরেই বাঙ্গালোর এক্সপ্রেস এল। আমাদের আর টিকিট করতে হোলো না, আমাদের বাঙ্গালোর থেকে হাবড়ার রিটার্ণ টিকিট ছিল।

আর্কোনাম থেকে গাড়ী ছেড়ে মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেসনে থামল না, একেবারে মাদ্রাজ সেণ্ট্রাল ষ্টেসনে ২—২৫ মিনিটে পৌছিল। আমাদের ডাক্তার ফণীন্দ্রনাথ এলিফ্যাণ্ট গেটের নিকট দিল্লী আনন্দ-ভবনে আশ্রয়
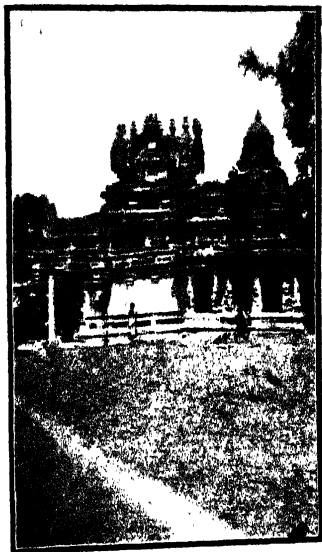
শিবকাঞ্চীর মন্দির—কন্‌জিভবম্

নিতে বলে দিয়েছিলেন। আমরা ষ্টেসন থেকে একখানি গাড়ী নিয়ে এই আনন্দ-ভবনে গেলাম। বেশ বড় বাড়ী। দ্বিতলে খাবার স্থান, ত্রিতলে থাকবার স্থান। আমরা প্রথম শ্রেণীর একটা ঘরে দুজনের থাক্‌বার ব্যবস্থা

করলাম। প্রত্যেক ঘরে বৈদ্যুতিক আলো আছে, পাখা নাই। খরচ কি হবে ঠিক জানি না। কাল জানতে পারব। হাত-মুখ ধুয়ে চা ও মিষ্টান্ন আহার করলাম। তাহার পর দুইখানি খাটে তাদের দেওয়া বিছানার উপর আমাদের বিছানা পাত্লাম। তখনও বেলা আছে; শরীরও তেমন অবসন্ন হয় নাই। তাই কিছু জিনিষপত্র কিন্বার জন্য হোটেলের কর্ত্তার শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে বের হলাম। বাজারে গিয়ে কয়েকখানি কাপড় চাদর কিনে নিয়ে সন্ধ্যার পরই বাসায় ফিরলাম। রাত্রি সাড়ে আটটার সময় আমাদের ঘরেই দুইজনের আহার্য্য দিয়ে গেল। রামেশ্বর বারবার বলে দিয়েছিল, লঙ্কা যেন অতি সামান্য দেওয়া হয়। তাই হয়েছিল। কলাপাতায় ভাত, ঘি, দুই রকম ডাল, দুই তিনটা তরকারী, কলাভাজা, অম্বল, দৈ ও চিনি দিয়ে বেশ পরিতোষ ভোজন হোল। তাহার পর মনে করেছিলাম, এমন সুন্দর বাড়ী, তেতালার ঘর, বেশ হাওয়া দিচ্ছে, খুব ঘুমাব। তা কিন্তু হোলো না, হাওয়া বন্ধ হয়ে গেল, আর দলে দলে মশা একেবারে অতিষ্ঠ করে তুল্ল। জানালা দরজা সব খুলে দিলাম, তবুও মশা।

পরদিন সোমবার রাত্রির মেলে দুইটা বার্থ হাবড়া পর্য্যন্ত রিজার্ভ করবার জন্য রামেশ্বর ষ্টেসনে গেলেন।

ভ্রমণ-কাহিনী ত' মাদ্রাজে এসে পড়েছে। কিন্তু, তা ব'লে একটা প্রধান তীর্থের কথা ত ফেলে রাখতে পারছি নে। সে কন্জিভরম্ বা কাঞ্চীর কথা। তবে, আজই মধ্যাহ্নে কন্জিভরম্ বা কাঞ্চী দর্শন করে এসেছি; সুতরাং এখানে ঐ স্থানের কথা বলায় বিলম্ব-জনিত অপরাধ হবে না।

শাস্ত্রমতে ভারতবর্ষে সাতটী পবিত্র পুরী আছে; যথা—কাশী, কাঞ্চী, অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, অবন্তী ও দ্বারকা। সেই কাঞ্চীই বর্ত্তমান কন্জিভরম্। এই সাতটী পুরীর মধ্যে তিনটী শিবস্থান, তিনটী বিষ্ণুস্থান;

অবশিষ্ট একটী—এই কন্‌জিভবম্ বা কাঞ্চী শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই স্থান। এই নগবের একপ্রান্তে শিব-কাঞ্চী, আব এক প্রান্তে বিষ্ণু-কাঞ্চী। আমরা যে পাণ্ডাব বাড়ী অতিথি হযেছিলাম, তিনি বিষ্ণু-কাঞ্চীব পাণ্ডা। তাঁব

বৃষভদেব—কন্‌জিভবম্

বাড়ীব কাছেই বিষ্ণুব মন্দিব। সেখান থেকে তিন মাইল গেলে তবে শিব-কাঞ্চী। এই কাঞ্চীতে সেকালে বিভিন্ন সময়ে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন—এই চাবি সম্প্রদাযেবই প্রাধান্য হযেছিল। তাব প্রমাণ এখনও

কাঞ্চীর মন্দিরাদিতে দেখতে পাওয়া যায়। এখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের রীতি ও শাস্ত্র অনুসারে মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয়েছিল। এমন এক সময় ছিল, যখন এই নগরের নানা স্থানে ১০৮টী শিবের মন্দির ও ১৮টী বিষ্ণু-মন্দির ছিল। এখন কিন্তু আমরা অত মন্দির দেখতে পেলাম না; তবে নানা কারণে অনেক মন্দির যে স্তূপে পরিণত হয়েছে, তা বেশ বুঝতে পারা গেল।

পূর্ব্বেই বলেছি, কাঞ্চীর অবস্থা যেন এখন অনেকটা মলিন হয়েছে। অথচ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যখন চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন-থ-সাং ভারত-ভ্রমণে আগমন করেন, তখন তিনি দেখেছিলেন যে, কাঞ্চীতে বৌদ্ধ-প্রভাব সে সময় অধিক ছিল। তিনি কাঞ্চীতে এসে অনেক সঙ্ঘারাম ও বহু বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দেখেছিলেন। তখন কাঞ্চী দ্রাবিড় রাজ্যের রাজধানী ছিল; নগরের পরিধি ছয় মাইল ছিল। আর রাজ্যের অধিবাসীগণ সাহসী, বিদ্বান ও ধর্ম্মপরায়ণ ছিল। হুয়েন-থ-সা তাঁর ভ্রমণ-কাহিনীতে বলে গিয়েছেন যে, ভারতবর্ষে তখন শৌর্য্য, বীর্য্য ও সাধনায় কাঞ্চীর সমকক্ষ আর কোন নগর ছিল না। তার পর শ্রীশঙ্করাচার্য্যের শৈব প্রভাবে ও শ্রীরামানুজাচার্য্যের বৈষ্ণব প্রভাবে কাঞ্চী থেকে বৌদ্ধ ও জৈন সম্প্রদায়ের প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল; এখন তাদের চিহ্ন কেবল কতকগুলি মন্দিরের নির্ম্মাণ-কৌশলে দৃষ্ট হয়ে থাকে।

পূর্ব্বে শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মঠ কামকোঠী পিঠ বিষ্ণু কাঞ্চীতে বরদা-রাজস্বামী মন্দিরের পার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ ১৬৮৬ অব্দের কথা। তার পর, অনেক দিন পরে শিব-কাঞ্চীতে শঙ্কর-মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কামাক্ষী মন্দিরই শিব-কাঞ্চীর সর্ব্বপ্রধান মন্দির এবং তাঁহার পূজা এখনও যথাযোগ্য সমারোহে হয়ে থাকে। যখন এই মন্দিরের বড়ই দুরবস্থা হয়, সেই সময় শ্রীশঙ্করাচার্য্য এখানে আগমন করে, এই মন্দিরে

অষ্ট-লক্ষ্মী স্থাপিত করেন এবং তাহার পরেই পুনরায় এই মন্দিরের উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। এই শিব-কাঞ্চীতে এখন শঙ্করাচার্য্যের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে এবং তিনি শঙ্করের অংশ বলে পূজিত হয়ে থাকেন। এই শিব-

বিষ্ণু মন্দির —কনজিভরম

কাঞ্চীর কামাক্ষী মন্দিরের একপার্শ্বে অন্নপূর্ণা দেবীরও একটী ছোট মন্দির আছে। আর একটী মন্দিরের কথাও উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের

দেবতার নাম একাম্রনাথ। ইহাঁর মন্দিরের গাত্রে মদন-ভস্মের যে চিত্র খোদিত আছে, তাহা অতি সুন্দর।

বিষ্ণু-কাঞ্চীতে একটী মন্দিরের মধ্যে কচ্ছপেশ্বর দেবের পূজা হয়ে থাকে—বিষ্ণু যে কুর্ম্মাবতার গ্রহণ করেছিলেন।

বিষ্ণু-কাঞ্চীর প্রধান মন্দিরগুলির নাম বল্‌ছি,—বরদারাজ, বৈকুণ্ঠ পেরুমল, পাণ্ডবদূতার, ভিলাক্কলি পেরুমল ও অষ্টভুজা। পূর্ব্বেই বলেছি, নগরের একপ্রান্তে শিব-কাঞ্চী, অপর প্রান্তে বিষ্ণু-কাঞ্চী। দুইটী কাঞ্চী দেখে যতদূর বুঝতে পারা গেল, তাতে মনে হয় একসময়ে শিব-কাঞ্চীরই অধিক প্রাধান্য ছিল; কারণ এখনও শিব-কাঞ্চীতে মন্দিরের ও দেব-দেবীর সংখ্যা বিষ্ণু-কাঞ্চী অপেক্ষা অধিক।

সেকালের যে সকল পুথি-পত্র এখানে আছে, তা থেকে জানা যায় যে, বিজয়নগরের রাজা অচ্যুত রায় কাঞ্চী-তীর্থে আগমন করেছিলেন এবং মন্দিরাদির পূজা উপলক্ষে অনেক টাকা ও সহস্র গাভী দান করে যান।

১২ই অক্টোবর, ২৬শে আশ্বিন, সোমবার—

আজ রাত্রি আটটার মেলে আমাদের কলিকাতায় যাত্রা করবার কথা ছিল; কিন্তু তা হোলো না। বাঙ্গালোরে যে ভদ্রলোকের সঙ্গে রামেশ্বর দেখা করতে গিয়েছিলেন, তিনি এখানে আছেন। রামেশ্বর বাঙ্গালোর থেকে তাঁকে মাদ্রাজের ঠিকানায় পত্র লিখেছিলেন! তিনি টেলিগ্রামে রামেশ্বরকে এখানে দেখা করতে বলেন। রামেশ্বর তাঁর জন্য কয়েকখানি ছবি এনেছিলেন। আজ প্রাতঃকালে তাঁর সঙ্গে রামেশ্বর দেখা করতে গিয়েছিলেন। তিনি রামেশ্বরকে আজকার জন্য আট্‌কিয়েছেন; এমন কি আমাকে পর্য্যন্ত তাঁর এখানকার বাড়ীতে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। রামেশ্বর এসে বল্‌ল যে, আজ মাদ্রাজে থেকে গেলে তার কয়েকখানি ছবি বিক্রয় হতে পারে; সুতরাং আজ আর যাওয়া হোলো না। এখানকারই দুইজন বোর্ডারের সঙ্গে ট্রামে চড়ে সমস্ত সহর প্রদক্ষিণ করে এলাম; সমুদ্র-তীরেও গিয়েছিলাম।

১৩ই অক্টোবর, ২৭শে আশ্বিন, মঙ্গলবার—

আজ সকালে উঠে, চা খেয়ে, স্নানাদি শেষ করে আটটার পর বের হলাম। প্রত্যেকে দুই পয়সা ট্রাম-ভাড়া দিয়ে সেণ্ট্রাল ষ্টেসনে গেলাম। বাসার এঁরা বলেছিলেন একুইরিয়াম ষ্টেসনের কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসায় জান্‌লাম উহা তিন মাইল দূরে সমুদ্রের একেবারে তীরে।

সেদিকে ট্রাম নাই। তখন যাতায়াতে একটাকা বন্দোবস্ত ক'রে একখানি রিক্স্ নিয়ে একুইরিয়ামে গেলাম। একটা ঘরে গ্লাস-কেসের মধ্যে নানাবিধ সামুদ্রিক সাপ, কচ্ছপ ও মাছ জলে ভাস্‌তে দেখ্‌লাম। সাপগুলি নাকি ভয়ানক বিষাক্ত। একটা সাপ দেখ্‌লাম, তার দুইপাশে দুইটা করিয়া লেজ, মধ্যভাগ এক। মাছ যে কত রকম ও কত বিচিত্র বর্ণের দেখলাম, তাহা বলা যায় না। একটা মাছ দেখলাম তার চার জোড়া ডানা; প্রত্যেক জোড়া ডানা এমন নানা রংয়ে চিত্রিত যে ময়ূরের পুচ্ছও তার কাছে হার মানে। রামেশ্বর বললেন, কোন চিত্রকরই হাজার চেষ্টা করেও এমন রং ফলাতে পারে না। প্রত্যেক মাছটার গায়ে নানা চিত্র। অনেকগুলি গ্লাস-কেসে গ্যাস্ দেওয়া হচ্ছে, বোধ হয় উত্তাপ ঠিক রাখবার জন্য। প্রবেশ-ফি দিনের অধিকাংশ সময় এক আনা হিসাবে। বিকেলে সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে সাতটা পর্য্যন্ত প্রবেশ-ফি চার আনা; কারণ সন্ধ্যার সময় বৈদ্যুতিক আলো দেওয়া হয়, তাতে নাকি মাছগুলি আরও সুন্দর দেখায়। আর তখন ঐ স্থানের পার্শ্বস্থ সুবিস্তৃত আলোকিত পথে সাহেব বিবি ও বড়মানুষেরা সমুদ্রের বায়ু সেবন করতে আসেন; সেই সময় এই সামুদ্রিক দ্রব্যের প্রদর্শনীতেও পদার্পণ করেন। তাই যাতে বাজে লোকের সমাগম না হয়, তারই জন্য ফি চার আনা। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা সাড়ে-সাতটা পর্য্যন্ত প্রদর্শনী খোলা থাকে। স্থানটী সহর থেকে দূরে, আদেয়ারের কাছে, সমুদ্র-বেলায়। রাস্তাটি এত সুন্দর যে আমাদের চৌরঙ্গীও তার কাছে হার মানে। একদিকে নীল সমুদ্র, আর একদিকে বড় বড় বাগানওয়ালা কম্পাউণ্ডের মধ্যে প্রকাণ্ডকায় সুদৃশ্য আফিস। বাড়ীগুলি মুসলমানী ধরণে আট-দশটা গম্বুজওয়ালা; দেখ্‌তে ঠিক ছবির মত।

সেখান থেকে রিক্স যখন ষ্টেসনে এল, তখন দশটা বেজে গিয়েছে।

ামেশ্বর সেখান থেকে রায়াপুরম্‌গামী ট্রামে চড়ে ব্যাঙ্কের দিকে গেল। াামিই পথ বলে দিলাম; কারণ পূর্ব্বদিন আমি বিকেলে ঐ সব দেখে াসেছিলাম। প্রকাণ্ডকায় সুদৃশ্য জেনারেল পোষ্ট-আফিস একেবারে াজপ্রাসাদের মত। পোষ্ট-আফিস দেখেই ভ্রাতৃপ্রতিম, সুকবি রায় াহাদুর রমণীমোহন ঘোষের কথা মনে হোলো। তিনি এখানে তিন-বছর পাষ্টমাষ্টার-জেনারেল ছিলেন। তখন এলে আর দিল্লী আনন্দ-ভবনে াকতে হোতো না, এই প্রাসাদেই অতিথি হতাম। আমি ষ্টেসন থেকে ামে উঠে দুই পয়সার টিকিট কিনে বাসায় এলাম।

আহারান্তে আমরা ঠিক করলাম যে, আমাদের গাড়ী যদিও রাত াটটায়, তা হোলেও আমরা তিনটার সময়ই হোটেল ত্যাগ করব; ারণ, আমরা রবিবার তিনটার সময় এসেছি, মঙ্গলবার তিনটা পর্য্যন্ত াক্‌লে পূরা দুই দিনের চার্জ্জ দিতে হবে; তার পর হলেই আর াকদিনের চার্জ্জ দুই জনের ৪৲ টাকা দিতে হয়। রাত্রের আহার ান্নপূর্ণা যা মাপিয়ে থাকেন তাই হবে। এই স্থির করে আমরা তিনটার াকটু পূর্ব্বেই ষ্টেসনে এলাম।

ষ্টেসনের দ্বিতীয় শ্রেণীর বিশ্রাম-কক্ষ অতি সুন্দর। সেখানে জিনিষপত্র রখে আমি বিশ্রাম করতে লাগলাম, রামেশ্বর একটু ঘুরে আস্‌তে গেল। দও বেরিয়ে গেল, আর মুষলধারে বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই রামেশ্বর যখন ফিরিল, তখন ছয়টা বেজেছে। আমরা সাতটার সময়ই আমাদের রিজার্ভ াাড়ীতে গিয়ে বস্‌লাম। রামেশ্বর ইতিমধ্যে যা হোক এক-রকম নৈশ-ভোজের ব্যবস্থা করেছিল; গাড়ী ছাড়বার পূর্ব্বে সে পর্ব্বই শেষ করা গেল। তার পর ঠিক আটটার সময় বৃষ্টির মধ্যেই গাড়ী ছাড়ল। আমাদের াাড়ীতে আর দুইটী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক উঠ্‌লেন; একজন কলিকাতায় আসবেন, অপর জন রাজমন্দ্রীতে নামবেন।

১৪ই অক্টোবর, ২৮শে আশ্বিন, বুধবার—

সারা রাত সমানভাবে বৃষ্টি চলেছে, চারিদিক জলে ডুবে গেছে। একখানি ইংরাজী কাগজ কিনে পড়লাম, কটকে সাত দিন সমানে জল হচ্ছে। আজ মধ্যাহ্নে রেলের ভোজনাগার থেকে ভাত ও নিরামিষ তরকারী এনে খেলাম, সেলামী দিতে হল দশ আনা। রাত্রিতে সামান্য জলখাবার খেয়েই কাটালাম। বৃষ্টির আর বিরাম নেই। দুইটার সময় ওয়াল্‌টেয়ার থেকে একটী ভদ্রলোক উঠ্‌লেন; তিনি খড়গপুর যাবেন। রাজমন্দ্রীতে যিনি নেমে গিয়েছিলেন, তাঁরই স্থান এই নবাগত ভদ্রলোকটী অধিকার করলেন। আমরা যে চা'র জন ছিলাম, তাই হলাম।

১৫ই অক্টোবর, ২৯শে আশ্বিন, বৃহস্পতিবার—

সকালে শুধু চা পান। দশটার সময় গাড়ী খড়গপুরে পৌছিলে কিছু পুরী মিঠাই দিয়ে জলযোগ করা গেল। তাহার পর হাবড়ায় পৌছিলাম, বেলা ১টা ৫ মিনিটে। সেই যে বৃষ্টি মাথায় করে মাদ্রাজ থেকে বেরিয়েছিলাম, সে বৃষ্টি আর থামে নাই, সমান ভাবে আছে।

হাবড়া থেকে একখানি ট্যাক্সি নিয়ে প্রথমে রামেশ্বরের বাসায় গেলাম। সেখানে আমাদের জিনিষপত্র পূর্ব্বেই এসেছিল। সেগুলি তুলে নিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই বাসায় এলাম অপরাহ্ন দুইটার সময়।

তার পর? তার পর আর কি,——সেই থোড়-বড়ি-খাড়া, আর খাড়া বড়ি থোড়;—সেই সংসার-সেবা, সেই বিষয়-কর্ম্ম! আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবেরা সকলেই বল্‌লেন, এই সুদীর্ঘ ভ্রমণে আমার শরীর দুর্ব্বল ত হয়-ই নাই, বরঞ্চ ভালই হয়েছে। এর জন্য যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করতে হয়, তা হোলে সে আমার শরীরের কাছে নয়; সে কৃতজ্ঞতা বর্দ্ধমানের

যুক্ত মহারাজাধিরাজ বাহাদুরেরই প্রাপ্য। তিনি যে আমাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করেছেন, সে কারণে নয়, তিনি আমাদের উপর অবিশ্রান্ত তাঁর স্নেহ বর্ষণ করেছেন, এবং সেই স্নেহে প্রীত হয়েই আমরা নিরাপদে দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করেছি, তারই জন্য তাঁকে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানিয়ে আমাদের ভ্রমণ-কাহিনী এইখানে শেষ করলাম।